সাধারণ ধর্মঘটে বন্ধ ব্যাঙ্কের শাখা

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

ধর্মঘটের দু'দিন শ্রমিক কর্মচারীদের অবস্থান

ডিসেম্বর'২০১৮ ■ ৪৭তম বর্ষ ■ অষ্টম সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

২০ ডিসেম্বর ২০১৮
সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের স্ট্রাইক নোটিশ প্রদানের কর্মসূচী

সমাবেশে উপস্থিত কর্মচারীগণ

সমাবেশ মঞ্চ

ড. সুজন চক্রবর্তী

বিজয় শঙ্কর সিংহ

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৮ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫.৪৫ মিনিটে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে রাজ্যের মুখ্যসচিবের নিকট ৮-৯ জানুয়ারি সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান ও কেন্দ্রীয় জমায়েতের কর্মসূচী রানী রাসমণি রোডে বিপুল কর্মচারী জমায়েতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যুক্ত কমিটি-স্টিয়ারিং কমিটি-জয়েন্ট কাউন্সিল যৌথভাবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আহুত এই কর্মসূচীতে শামিল হয়। ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং সর্বভারতীয় ফেডারেশনগুলি যৌথভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক-বিরোধী-জনবিরোধী নীতি সমূহের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট আহ্বান করেছে। আমাদের সর্বভারতীয় সংগঠন সারাভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছে। আমরাও তার অংশীদার হিসাবে শামিল হব। সাথে সাথে সর্বভারতীয় ১২ দফা দাবির সঙ্গে আমাদের জ্বলন্ত দাবি— (১) ৫৬ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতা এবং ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট অবিলম্বে প্রকাশ ও কার্যকর করা (২) ধর্মঘটের অধিকার সহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা ও রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখা— এই দু'দফা দাবিকে যুক্ত করে সর্বমোট ১৪ দফা দাবিকে সামনে রেখে আমরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যসচিবের নিকট ধর্মঘটের সমর্থনে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান করেছি। সংগঠন দাবি জানাচ্ছে শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার রক্ষা করতে হবে সরকারকে। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কেউই ন্যায্য অধিকার দিতে রাজি নয় কর্মচারীদের। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি দাবি জানাচ্ছে স্থায়ী কাজে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে। কেন্দ্র ও রাজ্যের সংস্থাগুলির শেয়ার বিক্রি করে তাদের বেসরকারীকরণ করা চলবে না।

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

৮-৯ জানুয়ারি ধর্মঘট
স্তব্ধ উৎপাদনের চাকা

কৃষকদের রেল-রোকো। ধর্মঘটে শ্রমিক-কৃষক সংহতি দেখলো সারা দেশ।

প্রথম ধাক্কা দিয়েছিলেন কৃষিজীবীরা। বছরের শুরুতেই মোদী সরকারকে পরের ধাক্কাটা দিলেন কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ। বিকল্পের সন্ধানে পরপর দু'দিনের এই সাধারণ ধর্মঘট কার্যত কাঁপিয়ে দিয়েছে গোটা দেশকে। পুলিশের বেয়নেট, লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, এমনকী গুলির মুখেও কোটি কোটি ধর্মঘটীরা যে স্বতঃস্ফূর্ততা দেখিয়েছেন, তা অভূতপূর্ব বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং আলোচকরাও। রাজস্থানে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। ৫০ জন জখম হওয়া সত্ত্বেও মাটি ছাড়েননি তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ঝাড়খণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছেন হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ। তাও জমি

অষ্টম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

২ জানুয়ারি ২০১৯
মাননীয় রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন

সারা রাজ্যের অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় রাজ্য প্রশাসনের প্রধান কার্যালয় 'নবান্নে' বামফ্রন্ট সরকার প্রদত্ত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার বলে কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি- দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। গত ২৯ নভেম্বর সেই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদকসহ ১৮ জন নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার ও পরবর্তীতে ১৫ জন নেতৃত্বকে দূরদুরান্তে বদলী করা হয়। রাজ্য প্রশাসনের এই প্রতিহিংসাপরায়ণ পদক্ষেপের প্রতিবাদে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির এক প্রতিনিধিদল গত ২ জানুয়ারি '১৯ মাননীয় রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ, যুগ্ম-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী এবং সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য ছাড়াও প্রতিনিধি দলের সাথে বাম পরিষদীয় দলনেতা ড. সুজন চক্রবর্ত্তী মাননীয় রাজ্যপালের সাথে আলোচনায় ছিলেন।

রাজভবনে নেতৃবৃন্দ

রাজভবন অভিমুখে মিছিল

পূর্ব অনুমোদিত ও নির্ধারিত সময় বেলা ৩.৩০ মিনিটে প্রতিনিধিদল রাজভবনে পৌঁছে মাননীয় রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি তুলে দেন। মাননীয় রাজ্যপাল তার সুবিপুল ব্যস্ততার মধ্যেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে স্মারকলিপি পাঠ করেন এবং গভীর আগ্রহ সহকারে প্রতিনিধি দলের বক্তব্য শোনেন এবং মত বিনিময় করেন। তিনি তার পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন, উত্তরপ্রদেশসহ অনেকক্ষেত্রেই বদলীর ক্ষেত্রে সংগঠনের কেন্দ্রীয় পদাধিকারীদের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়। ইতিপূর্বে সুনির্দিষ্ট বদলী নীতি থাকা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে রাজ্যের বর্তমান প্রশাসন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বা তার অন্তর্ভুক্ত সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের যেভাবে

পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

মাননীয় রাজ্যপালের কাছে সংগঠনের পত্র

Memo No. Co-ordi/103/18 **Date : 21.12.2018**

To
His Excellency,
The Governor of West Bengal, Rajbhavan, Kolkata
Hon'ble Sir,

Most respectfully and humbly, the undersigned, on behalf of all the State Government employees as well as the employees, teachers and non-teaching members of different state run and the state sponsored institutions of this State, intend to bring to your Honour's kind conscience that, we all have been passing through, probably the darkest phase of our service carrier, as financial deprivation and prohibition on our trade union rights, both at the will of the State Government, are looming large upon us.

In the recent past. i.e. on 29th November, 2018, while we, keeping ourselves confined within the statutory limit of our trade union rights, as inscribed in our Service Rules, were about to start a demonstrative programme during tiffin hours (1.30 p.m.-2 p.m.) inside the campus of state administrative Head quarters 'Nabanna', the police force deputed there on duty, rushed towards us and staging a mockery of minimal democratic norms, took all of us present there in their custody to detain us in Shibpur P.S. Howrah, for a couple of hours.

But the retaliating mode of the State Govt. did not end there, as within a day or two after that incident all of us received penal transfer orders with postings at the furthest conrner of North Bengal violating all the policies of transfer.

Under this circumstances, in order to portray a vivid picture of misrules of the present dispensation of our State, we seek your Honour's kind audience on 2nd January, 2019, at any time as your Honour deem convenient.

And for this act of kindness we will remain grateful.

With regards,

Yours faithfully
Bijoy Sankar Sinha
(Bijoy Sankar Sinha)
General Secretary

সম্পাদকীয়

চিন্তার ঐক্য ও রাজনৈতিক বোঝাপড়া

ক্লাসিক্যাল সংজ্ঞা অনুযায়ী রাজনৈতিক বিরোধিতার অর্থ হলো, আদর্শগত ও নীতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে নির্মিত ভিন্ন মত ও পথ। আদর্শগত বিরোধিতা একটা খুবই বড় বিষয়। যার সাথে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন জড়িত। স্বভাবতই, শুধুমাত্র আমাদের দেশ কেন, সারা বিশ্বজুড়েই মূল স্রোতের তথাকথিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এমন আদর্শগত বিরোধিতা খুঁজতে গেলে হতাশ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বিশেষ করে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, যা রাজনৈতিক মতাদর্শের মূল ভিত্তি, তার নিরিখে এ কথা তো কার্যত একশো শতাংশ সঠিক। আমাদের দেশের দুটি প্রধান জাতীয় দল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে যদি তুলনামূলক আলোচনা করি, তাহলে দেখবো অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে এই দুটি দলের মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই। এই দুটি জাতীয় দলের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যের শক্তিশালী আঞ্চলিক দলগুলির দিকে যদি তাকাই, তাহলেও একই চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে। কোথাও এরা কংগ্রেস বা বিজেপির সাথে লড়াই করছে, কোথাও এরা নিজেরাই লড়ছে—কিন্তু এই লড়াইয়ে আর যাই থাকুক, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কোনো এজেন্ডা কখনোই হয় না।

উন্নত দেশসমূহ, যারা নিজেদের গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলে দাবি করে, সেখানেও অবস্থা একইরকম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুটি প্রধান বিরোধী দল রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটসের মধ্যে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী তথা আদর্শগত কোনো বিরোধিতাই নেই। একই কথা প্রযোজ্য ব্রিটেনের কনজারভেটিভ এবং লেবারদের সম্পর্কে। অতীতে লেবার পার্টি কিছুটা হাল্কাভাবে ভিন্ন সুরে কথা বলার চেষ্টা করলেও, এখন সেসব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। ফলে বিশ্বজুড়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলের অভাব না থাকলেও, এবং প্রায়শই তাদের মাধ্যে ধুন্ধুমার 'রাজনৈতিক লড়াই'-এর খবর শোনা গেলেও, সেই লড়াই আদৌ কোনো আদর্শগত বিরোধিতার বহিঃপ্রকাশ নয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, বিশ্বজুড়ে প্রতিনিয়ত বহমান যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের খবর আমরা পাই, তা কি সম্পূর্ণই আদর্শগত দ্বন্দ্ব রহিত। না তা নয়। আদর্শগত বিরোধিতা বা দ্বন্দ্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু তা খুঁজতে গেলে, বা আলোচনা করতে হলে, মোটা দাগে ভাগ করা বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী দলগুলিকে দু'পাশে রেখে সেই আলোচনা করতে হবে। তবে 'বামপন্থী দল' এই শব্দযুগল ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণপন্থী দলগুলির সাথে আদর্শগত পার্থক্যের জায়গাটা সব বামপন্থী দলের একইরকম তা কিন্তু নয়। কিছু কিছু বামপন্থী দল রয়েছে (সারা বিশ্বেই) যাদের আদর্শগত অবস্থানের বেশ কিছুটা অংশ কেমন যেন ধূসর। কাগজে-কলমে, কথা-বার্তায় খানিকটা বাম-বাম ভাব থাকলেও, কার্যক্ষেত্রে কখনও কখনও দক্ষিণপন্থী দলের সাথে এদের বিভাজন রেখাটা অস্পষ্ট হয়ে যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান নির্ধারিত বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা অনুযায়ী এরা 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের পর্যায়ভুক্ত। তবে এই অস্বচ্ছতা বা অস্পষ্টতা ইত্যাদি সবটাই কিন্তু অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি প্রশ্নে এঁদের অবস্থান কিন্তু স্পষ্টতই দক্ষিণপন্থার বিপ্রতীপে। অর্থাৎ বামপন্থা শব্দটির যে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা রয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলি মাত্রায় এরা উচ্চকিত বামপন্থী। স্বভাবতই অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে, কখনও কখনও, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে দোদুল্যমানতা থাকলেও, ঐক্যবদ্ধ বাম আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে এই ধরনের দলগুলি সাধারণভাবে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

আদর্শগত অবস্থানের প্রশ্নে দক্ষিণপন্থী দলগুলির সাথে একেবারে খাড়াখাড়ি বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করে সাম্যবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলি। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে এদের সাথে দক্ষিণপন্থীদের কোনো মিলই থাকে না। আমাদের দেশসহ বিশ্বের সব দেশেই এদের অবস্থান রয়েছে। কোনো কোনো দেশে দক্ষিণপন্থী দলগুলির তুলনায় হয়তো বা এরা কিছুটা দুর্বল। কিন্তু গরীব মানুষ রয়েছেন, অথচ গরীব মানুষের রাজনৈতিক দল সাম্যবাদী দল নেই—না, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি।

আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নীতি এবং নীতির ভিত্তিতে গৃহীত হয় কর্মসূচী। তাই আদর্শের জায়গাটায় পার্থক্য না থাকলে, আদর্শজাত নীতি এবং নীতিজাত কর্মসূচীর মৌলিক কোনো পার্থক্য থাকে না। যে পার্থক্যটুকু থাকে তা হলো, জনগণের আস্থা অর্জনের লক্ষে রঙ-বেরঙের মোড়কের পার্থক্য। জনগণও যে এটা বোঝেন না, তা নয়। কিন্তু কখনো কখনো তাঁদেরও কিছুটা অসহায় অবস্থায় পড়তে হয়। তৃতীয় কোনো বিকল্প (অর্থাৎ নীতি ও কর্মসূচীগত স্পষ্ট পার্থক্য) হাতের কাছে না থাকলে, পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রঙের মোড়ক তাঁরা খুলে খুলে দেখেন, যদি ভালো কিছু পাওয়া যায় এই আশায়।

দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি এটা জানে যে তারা কেউই বিকল্প কোনো দিশা মানুষকে দেখাবে না। দেখাতে চায়ও না। তাই নীতি, কর্মসূচী ইত্যাদি বিষয়গুলি গুলিয়ে দেওয়ার জন্য তারা সামনে আনে কিছু ব্যক্তিকে। যেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা নির্বাচন শুধুমাত্র কয়েকজন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সংঘাতের বিষয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয় ব্যক্তিকেন্দ্রীক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহে।

এই সামগ্রিক আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের দেশের বর্তমান শাসক দল ও রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা যদি করি, তাহলে সাধারণ অনুসিদ্ধান্তগুলি হতে পারে—(১) কেন্দ্র ও রাজ্যের উভয় শাসকদলই যেহেতু দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল, স্বভাবতই এই দুই দলের মধ্যে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে আদর্শগত কোনো ফারাক নেই, (২) বুনিয়াদি ক্ষেত্রে (অর্থনীতি) আদর্শগত কোনো ফারাক না থাকার ফলে, নীতি ও কর্মসূচীর ক্ষেত্রেও কার্যত কোনো পার্থক্য নেই এবং (৩) নীতিগত ও কর্মসূচীগত কোনো পার্থক্য না থাকার ফলে, বিরোধিতার পরিসরটি মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রীক হয়ে পড়ে। বর্তমান সময়ে আমাদের রাজ্যের সংবাদ মাধ্যমগুলির প্রচার পরিকল্পনা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, দুই শাসকদলের দুই প্রধান ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বকে যাবতীয় বিরোধিতার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

এ পর্যন্ত যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা হলো, তা আমাদের রাজ্যের শাসকদলের মতোই, আর পাঁচটি আঞ্চলিক দলের ক্ষেত্রেও সত্য। তাই আমাদের রাজ্যের শাসকদল যেমন একসময় কেন্দ্রের শাসকদলের সাথে ঘর করেছে, কিন্তু এখন বিরোধী ভূমিকার আস্ফালন দেখাচ্ছে, ঠিক তেমনই, সবাই না হলেও বেশ কিছু আঞ্চলিক দল আমাদের দেশে রয়েছে, যারা কোনো না কোনো সময় কেন্দ্রীয় শাসকদলের জোটসঙ্গী হয়েছে। এঁদেরও বুনিয়াদি দিক থেকে কোনো পার্থক্য না থাকার ফলে এই দোদুল্যমানতা দেখা যায়। আবার যখন এঁরা বিরোধিতায় নামেন, তখনও বিরোধিতার পরিসরটা মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রীক বিরোধিতায় পর্যবসিত হয়। এ পর্যন্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, আমাদের রাজ্যের শাসকদল ও অন্যান্য আঞ্চলিক দল একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে। কিন্তু বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত সমীকরণ সঠিক হবে না। কারণ বর্তমানে কেন্দ্রের শাসকদলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার ফলে, তাঁরা অনেক বেশি আগ্রাসী ভঙ্গিমায় নিজস্ব রাজনৈতিক-সামাজিক এজেন্ডা, অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদের এজেন্ডাকে কার্যকরী করতে চাইছে। আর্থিক নীতির প্রশ্নের এখন তাঁরা নয়া উদারবাদের পক্ষে অনেক বেশি বেপরোয়া। আর্থিক নীতির প্রশ্নে রাজনৈতিক স্তরে কোনো বিকল্প বক্তব্য যে বামপন্থী দলগুলি ব্যতিরেকে কোনো দক্ষিণপন্থী দলের নেই, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'হিন্দুত্ববাদী' কর্মসূচী কার্যকরী করার যে সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগ বিপুল তৎপরতায় জারি রয়েছে, যা দেশের ঐক্য ও সংহতিকে বিপদাপন্ন করে তুলছে, তার বিরুদ্ধে অধিকাংশ দক্ষিণপন্থী দলও কিন্তু সোচ্চার হতে শুরু করেছে। যারা সোচ্চার হচ্ছে, ধর্ম সম্পর্কে তাদের যে অবস্থানই থাকুক, ধর্ম আর ধর্ম মিশ্রিত রাজনীতি অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার প্রভেদটা এদের কাছে অনেকটাই স্পষ্ট। তাই দেশের ঐক্য বিপন্নকারী কেন্দ্রের শাসকদল যাতে নতুন করে কোনো জমি দখল করতে না পারে, সে ব্যাপারে তারা সচেষ্ট হতে শুরু করেছে।

অথচ আমাদের রাজ্যের শাসক দলটির ভূমিকা এই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুখে ব্যক্তি বিরোধিতা জারি থাকলেও, কেন্দ্রের শাসকদলের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজ্যের শাসকদল যে ভূমিকা গ্রহণ করছে, তাতে কার্যত কেন্দ্রের শাসকদলের উদ্যোগই ফলপ্রসু হচ্ছে। যার প্রমাণ হলো, কেন্দ্রের শাসক দলকে পরিচালনা করে যে সংগঠনটি (আর এস এস), তাদের বিভিন্ন ধরনের শাখার সংখ্যা হু হু করে এই রাজ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও এমন কিছু ভূমিকা রাজ্য সরকার গ্রহণ করছে, যা কেন্দ্রের শাসকদলেরই হাতকে শক্ত করবে। যেমন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটকে ভাঙার জন্য এ রাজ্যে শাসকদল যে ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করলো, তা কার্যত এ রাজ্যে কেন্দ্রের শাসকদলের পায়ের তলার জমিকেই শক্ত করবে। এই ভূমিকা কোন রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা কোনো আঞ্চলিক দলই গ্রহণ করেনি। প্রাথমিকভাবে মিডিয়া এই দুই শক্তি পরস্পর সদা যুযুধান—এমন একটা ছবি কিছুটা সাফল্যের সাথে তৈরি করতে পেরেছিল। একাংশের মানুষও কিছুটা বিভ্রান্ত হচ্ছিলেন। কিন্তু যখনই লাল ঝাণ্ডা কাঁধে শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারীদের উপর্যুপরি আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়তে শুরু করলো রাজপথে, তখনই দিশেহারা কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলের রাজনৈতিক গটআপ প্রকাশ্যে চলে এলো। প্রকাশ্যে বিরোধিতা, আর পর্দার আড়ালে 'গট-আপ'—এই গোটা চিত্রনাট্যটাই তৈরি হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে সংশোধিত ও সংযোজিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি ও এদেশের কর্পোরেট পুঁজির নির্দেশনা ও প্রযোজনায়। লক্ষ্য, নয়া উদারবাদ এবং উদারবাদের রথের চাকার ভ্রমণ পথকে মসৃণ করার জন্য ব্যবহৃত সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে যাঁরা লালঝাণ্ডা কাঁধে জান কবুল লড়াই করেন তাঁদের দুর্বল করা। তবে পর্দার আড়ালে গড়ে ওঠা সখ্যতা, শুধুমাত্র বাইরে থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সখ্যতা নয়। এই দুই দলের চারিত্রিক সাদৃশ্য, সখ্যতা গড়ে ওঠার কাজটাকে সহজ করেছে। সাদৃশ্য হলো, উভয়েই রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণে 'লুম্পেন বাহিনী'কে ব্যবহার করা ও জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে উদ্দেশ্যসিদ্ধ করার কাজে দক্ষ।

কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা হলো, এই ধরনের রাজনৈতিক দল ও শাসকের রাজনৈতিক মঞ্চে বিচরণ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। উত্থান উল্কাবেগে ঘটলেও, পতনও হয় ততোধিক সশব্দে। □

১৫ জানুয়ারি, ২০১৯

শোক সংবাদ

নিরুপম সেন

দেশের গণতান্ত্রিক ও বাম আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সিপিআই(এম)-এর পলিট ব্যুরোর প্রাক্তন সদস্য, মার্কসবাদী তাত্ত্বিক, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কমরেড নিরুপম সেন গত ২৪ ডিসেম্বর ভোরে বিধাননগরের একটি বেসরকারী হাসপাতালে প্রয়াত হন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২। তিনি স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে রেখে গেছেন। তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ছিলেন।

তাঁর জন্ম ১৯৪৬ সালের ৮ অক্টোবর। বর্ধমান জেলার গোবিন্দপুরের, রায়নুর হাইস্কুলে পড়াশুনা করেন এবং কৃতিত্বের সাথে স্কুলফাইনাল পাশ করেন। তাঁর পিতা ভূজঙ্গভূষণ সেন ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ১৯৬১ সালে বর্ধমান রাজ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। তিনি সেখানে ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হন ও জনপ্রিয় নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। ছাত্র অবস্থাতেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে নিরুপম সেন বর্ধমান জেলার ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক নির্বাচিত হন। বর্ধমান রাজ কলেজ থেকেই তিনি বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক হন ও পরে কলা বিভাগেও স্নাতক হন।

শিক্ষান্তে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতার কাজ করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি সিপিআই(এম) পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন। ২০০৮ সালে তিনি পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৭, ২০০১, ২০০৬ সালে বর্ধমান (দক্ষিণ) কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন।

২০০১ সালে তিনি বামফ্রন্ট সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০০৬ সালে তিনি একই দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। শিল্পায়নের এই দশ বছরে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সময় কৃষির সাফল্যর উপর দাঁড়িয়ে কৃষক ও খেতমজুরের স্বার্থরক্ষা করে রাজ্যে নতুন শিল্প ও পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়— এবং শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিকাঠামো উন্নয়নে এবং বিদ্যুৎ পর্ষদকে অর্থনৈতিকভাবে সুদৃঢ় করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য দেখিয়েছিলেন।

টাটাদের সঙ্গে দর কষাকষি করে উত্তরাখণ্ড থেকে তাদের অটো মোবাইলের প্রকল্প সিঙ্গুরে তিনি টেনে এনেছিলেন। যদিও শেষপর্যন্ত সিঙ্গুরে তা রূপায়িত হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন সৃজনশীল মার্কসবাদী চিন্তাবিদ। বামফ্রন্টের বিকল্প অভিমুখ ও বাস্তবে তার রূপায়ণ তিনি মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন ও তিনি ছিলেন এর অন্যতম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকার। তিনি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের রচয়িতা। তাঁর লেখা কয়েকটি বই হল 'রাজনৈতিক অর্থনীতি', 'বিকল্পের সন্ধানে', 'সময়ের দর্পনে কমিউনিস্ট ইস্তেহার', 'সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলায়', 'প্রসঙ্গ মতাদর্শ' ইত্যাদি। □

মৃণাল সেন

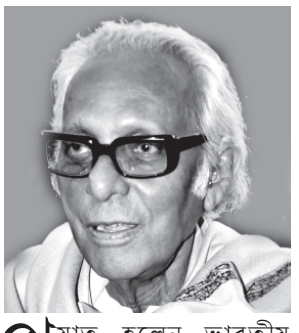

প্রয়াত হলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র জগৎ-এর অন্যতম সৃজনশীল প্রতিভা, আজীবন বামপন্থায় বিশ্বাসী, সমাজ সচেতন ও মানবতাবাদী মৃণাল সেন। গত ৩০ ডিসেম্বর দক্ষিণ কলকাতার নিজ বাস ভবনে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন। বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। রেখে গেছেন পুত্র কুনালকে। তাঁর স্ত্রী গীতা সেন আগেই প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন দক্ষ অভিনেত্রী।

মৃণাল সেন ১৯২৩ সালের ১৪ মে অধুনা বাংলা দেশের ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দীনেশ সেন ছিলেন একজন স্বনামধন্য আইনজীবী। তাঁদের পরিবার ছিল রাজনৈতিক পরিবার। মৃণাল সেনের পিতা বিপ্লবীদের হয়ে নিখরচায় আইনি লড়াই লড়তেন। সুভাষচন্দ্র বসু ঐ বাড়ীতে আত্মগোপন করেছিলেন। কাজী নজরুল ও কবি জসিমুদ্দিন ঐ বাড়িতে আসতেন। মৃণাল সেন শৈশব থেকেই রাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন। ফরিদপুরের ঈশান স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ঐ জেলারই রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ইন্টার মিডিয়েট পাশ করেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে কলকাতায় আসেন ও স্কটিশচার্চ কলেজে পদার্থ বিদ্যায় অনার্স নিয়ে পড়াশুনা করেন।

চল্লিশের দশকের উত্তাল সময়ে তিনি বামপন্থায় আকর্ষিত হন ও কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন ও গণনাট্য সংঘের সদস্য হন। মার্কসীয় আন্তর্জাতিকতাবাদে নিজেকে যুক্ত করেন। চলচ্চিত্রে আগমন বই পড়ার মাধ্যমে। তার চলচ্চিত্র ছিল কঠিন বাস্তবতাবাদের উপর দাঁড়িয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা, সমাজ সচেতনতা ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রকাশ।

তাঁর প্রথম ছবি ছিল 'রাত ভোর' (১৯৫৫)। দ্বিতীয় ছবি ছিল 'নীল আকাশের নীচে' (১৯৫৮)। যে ছবিতে মৃণাল সেনের সৃজনশীল বৈশিষ্ট ফুটে উঠেছিল, তাহল বাইশে শ্রাবণ (১৯৬০)।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে নতুন প্রবাহ আনে তার বিখ্যাত ছবি 'ভুবন সোম' (১৯৬৯)। সাতের দশকের অস্থিরতা, সমাজের ভাঙন, ছিন্নভিন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী তবু লড়াইয়ের ময়দানে থাকা তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন পর পর তিনটি ছবিতে, ইন্টারভিউ (১৯৭১) 'কলকাতা ৭১ (১৯৭২), পদাতিক (১৯৭৩)। মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে তিনি আঘাত করেছেন একদিন প্রতিদিন (১৯৭৯), খারিজ (১৯৮২) ছবির মাধ্যমে।

মৃণাল সেনের আরো অনেকগুলি স্মরণীয় ছবি আছে—সেগুলো হল, 'আকালের সন্ধানে' (১৯৮০), মাটির মনিষ (ওড়িয়া), ওকা ওরিকথা (তেলেগু) খণ্ডহার। তাঁর শেষ পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি 'আমার ভুবন' (২০১২)।

তিনি চারবার জাতীয় চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন। দাদা সাহেব ফালকে ও পদ্মভূষণ সম্মান লাভ করেছেন। আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন বহুবার। ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ছিলেন। □

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৫ ডিসেম্বর দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারী হাসপাতালে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৯৪। তিনি বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন। তিনি রেখে গেছেন তাঁর দুই কন্যাকে। সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী। জন্ম ১৯২৪ সালের ১৯ অক্টোবর অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরে। ১৯৩০ সালে কলকাতায় চলে আসেন। মিত্র ইনস্টিটিউশন, বঙ্গবাসী ও সেন্টপলস কলেজে শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করেন। সত্যযুগ পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু। ১৯৫১ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজে যোগ দেন।

ছোটবেলা থেকেই ছড়া লেখায় পারদর্শী ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'নীল নির্জন' প্রকাশিত হয়। তিনি প্রায় তিরিশটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। তারমধ্যে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলি হল, 'একে একে অন্ধকার বারান্দা', প্রথম নায়ক, নীরক্ত করবী, সময় বড় কম, ঘুমিয়ে পড়ার আগে, নক্ষত্রটি জয়ের জন্য, কলকাতার যীশু, উলঙ্গ রাজা ইত্যাদি।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় পর পর এসেছে, শহরের সাজানো জীবন, পৃথিবীর কথা ও বাস্তবতার কথা। তার বিখ্যাত 'অমল কান্তি'র কয়েকটি লাইন—'আমরা কেউ' মাস্টার হতে চেয়েছিলাম, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল/ অমল কান্তি সে-সব কিছু হতে চায়নি/ সে রদ্দুর হতে চেয়েছিল/ ক্ষান্ত বর্ষন কাক-ডাকা বিকেলের সেই লাজুক রোদ্দুর/ জাম আর জামরুলের পাতায়/ যা নাকি অল্প একটু হাসির মতন লেগে থাকে।"

শাসকের অতি দাপট, মিথ্যাচার, অন্যায়ের প্রেক্ষাপটে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ উলঙ্গ রাজার কয়েকটি লাইন—

"শিশুটি কোথায় গেল? কেউ কি কোথাও তাকে কোনো/ পাহাড়ের গোপন গুহায়/লুকিয়ে রেখেছে?/নাকি সে পাথর- ঘাস-মাটি নিয়ে খেলতে খেলতে/ঘুমিয়ে পড়েছে/কোন দূর/নির্জন নদীর ধারে, কিংবা কোনো প্রান্তরের গাছের ছায়ার?/যাও, তাকে যেমন করেই হোক/খুজে আনো/সে এসে একবার এই উলঙ্গ রাজার সামনে/ নির্ভয়ে দাঁড়াক/সে তাকে একবার এই হাততালির উর্ধ্বে গলা তুলে/ জিজ্ঞাসা করুক/রাজা তোর কাপড় কোথায়?" তিনি কয়েকটি রহস্য উপন্যাস লিখেছেন, শ্যামনিবাস রহস্য, মুকুন্দপুরের মনসা, বিষানগড়ের সোনা, রাত তখন তিনটে ইত্যাদি।

আনন্দমেলার দীর্ঘদিনের সম্পাদক ছিলেন তিনি। বাংলাভাষায় প্রথম টিনটিনের অনুবাদ তিনি করেন। ছোটদের জন্য অনেক কবিতা ও ছড়া লিখেছেন। তার মধ্যে সাদা বাঘ, বিবির ছড়া, বারো মাসের ছড়া, ভোরের পাখি, খোকনের খাতা ইত্যাদি।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯৭৪ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান। ২০১০ সালে পান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যাসাগর পুরস্কার। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে তিনি ছিলেন বাংলা আকাদেমির সভাপতি। □

সাম্প্রদায়িক শক্তির তুরূপের তাস— রামমন্দির

মানস কুমার বড়ুয়া

সংঘ পরিবার কর্তৃক অযোধ্যায় তথাকথিত রামের জন্মস্থানে রামমন্দির বানানোর 'পবিত্র' কর্তব্যের সূচনা হয়েছিল ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রায় ৫০০ বছরের পুরানো একটি মসজিদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। ১৯৯২ থেকে ২০১৯ গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। অযোধ্যার বিতর্কিত জমি নিয়ে মামলা এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। এই দীর্ঘ সময়কালে রামমন্দির নির্মাণের ইস্যুটি তুরূপের তাস হিসেবে ব্যবহার করেছে সংঘ পরিবার। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ এবং তার রাজনৈতিক শাখা ভারতীয় জনতা পার্টি ''রাম মন্দির নির্মাণ''-কেই তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে বিভিন্ন সময়। বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে থাকাকালীন অথবা না থাকাকালীন দুই অবস্থাতেই ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে এই ইস্যুকে সামনে নিয়ে এসেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নয়া উদারনীতির নির্বিচারে প্রয়োগের ফলে দেশবাসীর যখন নাভিশ্বাস উঠছে এবং তারা যখন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন, তখন হিন্দুত্ববাদের তাস খেলে মানুষের ঐক্যকে ভাঙতে উদ্যত হয়েছে বিজেপি। হিন্দুত্ববাদের রাজনীতির তুরূপের তাস হলো তথাকথিত 'রামমন্দির নির্মাণ' ইস্যুটি।

সংঘ পরিবার এবং বিজেপি তাদের হিন্দু ধর্মের একমাত্র রক্ষাকর্তা হিসেবে দাবি করে। কিন্তু এদের আচরণের মধ্যে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, চৈতন্যদেবের প্রচারিত হিন্দু ধর্মের সহনশীলতা, পরমত সহিষ্ণুতা লক্ষ্য করা যায় না। এদের একমাত্র লক্ষ্য অন্য ধর্মাবলম্বী বিশেষত মুসলিমদের শত্রু হিসাবে দেখা এবং আক্রমণ করা। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলতে গিয়ে যদি হিন্দু মন্দির ভাঙতে হয় তাতেও এদের কোনো আপত্তি নেই। এমনই ধার্মিক এরা। বাবরি মসজিদ ধ্বংস 'প্রকল্পে'র কাজ উত্তরপ্রদেশের কল্যাণ সিং সরকার শুরু করেছিল ১৯৯১-এর অক্টোবরে এই মসজিদে এবং তার সংলগ্ন ২.৭৭ একর জমি অধিগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। সরকার বলেছিল এই অধিগ্রহণ বাবরি মসজিদ ও রাম চবুতর সংলগ্ন এলাকা সৌন্দর্য্যকরণ এবং আধুনিকীকরণের জন্য। কয়েক শত নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয় এই উদ্দেশ্যে। আশ্চর্যের বিষয় হলো হিন্দু ধর্মের ধ্বজাধারিরা ঐতিহ্যসম্বলিত বিভিন্ন নির্মাণ যেমন ভাঙল তেমনি হিন্দুদের বেশ কয়েকটি পবিত্র উপাসনাস্থল ও ধূলিসাৎ করে দিল। সুমিত্রা ভবন, সাক্ষী গোপাল মন্দিরের মতো ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাসনাস্থল ভেঙে ফেলা হয়েছিল সেই সময়।

বর্তমান সময়ে আবার প্ররোচনামূলকভাবে বারাণসীতে কাশি বিশ্বনাথ মন্দির, জ্ঞানব্যাপি মসজিদ সংলগ্ন এলাকাও একই অজুহাতে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় একটা স্লোগান উঠেছিল—''ইয়ে তো সির্ফ ঝাঁকি হ্যায়, আব কাশি মথুরা বাকি হ্যায়'। সংঘ পরিবারের টার্গেট অনুযায়ী কাশি বিশ্বনাথ মন্দির লাগোয়া ঐতিহ্যশালী মসজিদ এখন টার্গেট। লোকসভা ভোট আসন্ন, বিজেপির পালে হাওয়া দিতে একমাত্র ভরসা উগ্র হিন্দুত্ববাদী কার্যকলাপ। কাশি বিশ্বনাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকা সংস্কারের নামেও শতশত বাড়ি, ধর্মস্থান, মন্দির ভেঙে ফেলা হচ্ছে নির্মমভাবে। আসল লক্ষ্য ঐতিহ্যশালী মসজিদটি। তাই সংঘ পরিবার চুপ। এখনও পর্যন্ত ৫৫টি হিন্দু ধর্মস্থানকে ভেঙে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুধর্মের 'পবিত্রতা' রক্ষা করার মহান কর্তব্য পালনে এগুলি যেন কোনো ব্যাপারই না সংঘ পরিবারের কাছে।

রামমন্দির নির্মাণের পিছনে কোনো ঐতিহাসিক যুক্তি নেই। রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক চরিত্র হলো রাম। হয়তো কিছু মানুষ বিশ্বাস করে রাম বাস্তবে ছিলেন এবং অযোধ্যার ঐ নির্দিষ্ট স্থানে জন্ম নিয়েছিলেন। এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই সাম্প্রদায়িক শক্তির রাজনীতি।

প্রথমত, বর্তমান অযোধ্যাই রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যা কি না তা নিয়ে মতভেদ আছে। বড় বড় ইতিহাসবিদদের গবেষণাকৃত মত হলো রামায়ণের অযোধ্যা বর্তমানে দিল্লির নিকটবর্তী সাকেত নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। বর্তমান অযোধ্যায় সেই সময় জনবসতি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

দ্বিতীয়ত, বাবরি মসজিদ ১৫২৮ সালে রাম জন্মস্থান মন্দির ভেঙে বাবর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এরও কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। বাবরি মসজিদ নির্মাণের কাজ ১৫২৮ সালে শুরু হয়নি, এমনকি পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয় লাভ করে ভারতের সিংহাসনে বাবরের অধিষ্ঠানের আগেই এই মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এটির সুনির্দিষ্ট তথ্য মেলে এই মসজিদের মধ্যে পাওয়া একটি ফলক থেকে। ফারসিতে দশ লাইনের একটি কবিতা ফলকে লেখা ছিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ লাইন বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়—''খাকন ও কাগফুর উপাধিপ্রাপ্ত বাদশা স্বয়ং উপস্থিত থেকে ৯৩০ হিজরাতে এই ধর্মীয় ভিত্তি স্থাপন করেন।'' ৯৩০ হিজরী সন হচ্ছে সেপ্টেম্বর ১৫২৩ সাল থেকে সেপ্টেম্বর ১৫২৪ সাল পর্যন্ত। ঐ সময়ে ভারতের সম্রাট ছিলেন ইব্রাহীম লোদী, বাবর নয়।

মৌলবাদী কোনো শক্তিই বিজ্ঞান-ইতিহাসে ভরসা করে না। তারা মানুষের অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কারগুলিকে প্রশ্রয় দেয়। মৌলবাদী রাজনৈতিক দল মানুষের বিশ্বাস নিয়ে রাজনীতি করে। আর এস এস-এর রাজনৈতিক শাখা বি জে পি অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ ইস্যু নিয়ে সেই ধরনের রাজনীতি করছে। যে রাজনীতি সমাজকে পিছনের দিকে টানে। রামমন্দির ইস্যুকেই ওরা ভারতের জনগণের একমাত্র মৌলিক সমস্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। রামমন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত রাজনীতি লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আবার খুঁচিয়ে তুলতে উঠে পড়ে লেগেছে সংঘ পরিবার ও বিজেপি। তাদের বর্তমান কৌশল নিয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বিজেপি একই সুরে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের জন্য বর্তমানে আইন প্রণয়নের বা অধ্যাদেশ জারি করার দাবি করছে। সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলা ঝুলে রয়েছে। এখন আর এস এস, বিজেপি এই বিষয় নিষ্পত্তিতে আইন চাইছে কেন, এর পরিণতিই বা কী এটা একটু আলোচনা করা দরকার।

সেপ্টেম্বর ২০১৮ ভারতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র অযোধ্যার জমি সংক্রান্ত মামলার শুনানি আবার চালু করার নির্দেশ দেন—যা দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। ১৯৯৪ সালের একটি নির্দেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর বেঞ্চে আবেদন করার আর্জি তিনি খারিজ করে দেন। ১৯৯৪-এর বিতর্কিত নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে—'ইসলাম ধর্ম অনুশীলন মসজিদ আবশ্যিক এবং নমাজ পাঠের জন্য মসজিদ আবশ্যিক প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। নমাজ যে কোনো স্থানে এমনকি প্রকাশ্যে পাঠ করা যেতে পারে'। তিন সদস্যের বেঞ্চ অযোধ্যা জমি সংক্রান্ত আবেদনের শুনানি ২৯ অক্টোবর ২০১৮ থেকে চালু করার কথা বলে। আর এস এস-বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও উত্তরপ্রদেশ সরকার বিতর্কিত স্থানে মন্দির নির্মাণকেই এই মুহূর্তে সারা দেশের সবচেয়ে জরুরি কাজ বলে মনে করে, তারা দাবি করে অতি দ্রুত এর নিষ্পত্তি করতে হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ উত্তরপ্রদেশ সরকারের দ্রুত শুনানি শুরুর আবেদনকে গুরুত্ব দেননি। তিনি এই

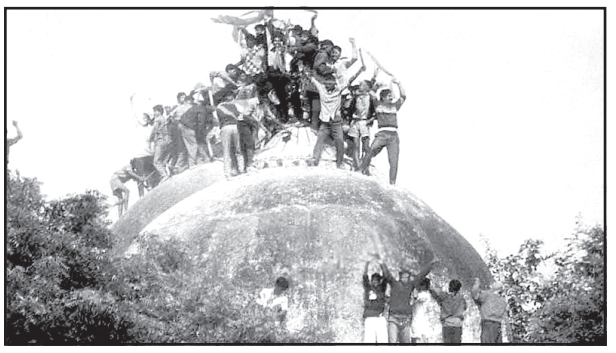

মামলার শুনানি নতুন বছরে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নিয়ে যান। এরপরই হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যে আদালতে মামলা এড়িয়ে আইন প্রণয়নের দাবি জোরালোভাবে উঠতে শুরু করে।

কেন্দ্রীয় সরকার এরই সূত্র ধরে বাবরি মসজিদ, রামমন্দির সমস্যার সমাধানে আইন আনতে চাইছে। এটা কি আদৌ সম্ভব? রাজনৈতিক কারণে সরকার যদি আইন করতে চায়—তাহলে একটি সাধারণ বিল এনে সেটাকে লোকসভা ও রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হবে। ভাবার বিষয় এটাই যে একটি সাধারণ আইনের মাধ্যমে বিতর্কিত জমিতে রামমন্দির নির্মাণ সম্ভব কি না। এটার বাস্তবতা নেই—কারণ সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে বলে দিয়েছে যে কোর্টের বিচারাধীন এই সংক্রান্ত বিষয় সমাধানের বিকল্প কোনোরকম উদ্যোগ সংবিধান বিরোধী পদক্ষেপ রূপে গণ্য হবে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকার Acquisition of certain Area of Ayodhya Act, 1993 পাস করিয়ে নেয় এবং এর মাধ্যমে বাবরি মসজিদের চারপাশের বেশ কিছুটা জমি অধিগ্রহণ করে নেয়। সেই সময় এলাহাবাদ হাইকোর্টে ঐ বিতর্কিত জমি নিয়ে একগুচ্ছ মামলার শুনানি চলছিল। তৎকালীন সরকারের জমি অধিগ্রহণের পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়। সুপ্রিম কোর্টে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ সরকারের উপরোক্ত আইনটিকে বহাল রাখে। কিন্তু ঐ আইনের ৪(৩) ধারা বাতিল করে, যেখানে বিচারাধীন বিষয়ের নিষ্পত্তির কোনো বিকল্প পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা ছিল।

সংবিধানের সপ্তম তফশিলে সংসদে আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে এমন ১০০টি বিষয়ের তালিকা রয়েছে। এছাড়াও কনকারেন্ট তালিকায় (লিস্ট-৩) আরো ৫২টি এইরকম বিষয় রয়েছে। এই তালিকাগুলি অনুযায়ী সংসদের পূর্ণ অধিকার আছে কোনো সম্পত্তি বা জমির দখল এবং ব্যবহার সংক্রান্ত আইন তৈরী করার। এমনকি সংসদ কোর্টে বিচারাধীন কোনো বিষয়ের ওপরও আইন তৈরি করতে পারে। কিন্তু সংবিধানই আবার বিচার ব্যবস্থাকেই নির্দিষ্ট করে দায়িত্ব দিয়েছে সংসদে গৃহীত যে কোনো আইনের সাংবিধানিক ভিত্তি আছে কিনা তা যাচাই করার।

সংবিধান মোতাবেক সরকার যেমন ঐ ২.৭৭ একর বিতর্কিত জমিতে মন্দির বানানোর আইন তৈরী করতে পারে। আবার সেই আইন সংবিধান সম্মত কিনা তা যাচাই করবার পূর্ণ ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে। আরেকটি বিষয় হলো যদি মন্দির তৈরির জন্য আইন করা হয়, তাহলে সেই আইন একটি অংশের পক্ষে যাবে, অন্য অংশের বিপক্ষে যাবে। পূর্বেই বিচারপতিরা মামলা চলাকালীন এই ধরনের মীমাংসাকে সমর্থন করেননি। উল্লেখ করা হয়েছিল যে এই মামলাকে কেবল দুটি প্রতিপক্ষের মামলা হিসেবে দেখা যাবে না।

রামজন্মভূমি আন্দোলনের শুরু থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও আর এস এস এই মত পোষণ করত যে, রামমন্দির নির্মাণের বিষয়টি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, কোর্টের উপর নয়। ১৯৮৬-তে আর এস এস তার প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল যে 'জন্মভূমি এলাকা ও তার সংলগ্ন এলাকা রামজন্মভূমি ট্রাস্ট-এর হাতে সরকার তুলে দিলে তারা 'পবিত্র স্থান'টির সংস্কার করবে। ১৯৮৭ সালে অপর একটি প্রস্তাবে দাবি করে সোমনাথ মন্দির সংস্কারের। প্রস্তাবে বলা হয় অতি প্রাচীন এবং অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত রাম জন্মভূমি মন্দিরকেও তার স্বমহিমায় পুনর্গঠন করা দরকার। ১৯৮৯ সালে আর এস এস তাদের কেন্দ্রীয় কল্যাণ মণ্ডল সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করে পুনরায় বলে রামজন্মভূমি ইস্যুটি কোর্টে নিষ্পত্তির বিষয় নয়।

আর এস এসের রাজনৈতিক শাখা ভারতীয় জনতা পার্টি ১৯৮৯ সালে রামমন্দির সংক্রান্ত বিষয়ে সরব হয়। হিমাচল প্রদেশের পালামপুরে ১৯৮৯ সালে বিজেপির ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, ''মানুষের বিশ্বাসকে সম্মান জানিয়ে রাম জন্মভূমিকে হিন্দুদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। দুটি সম্প্রদায়ের যৌথ আলোচনায় বিষয়টি না মিটলে উপযুক্ত আইন তৈরি করে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলা দরকার। তবে বিচারব্যবস্থা এই সমস্যা সমাধানে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না।'' আর এস এস ভারতের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, বিচার ব্যবস্থার প্রতিও নয়। সেই বক্তব্যই বেরিয়ে এসেছে বিজেপির উপরোক্ত প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে।

১৯৯০ সালে ভি পি সিং-এর সরকারের সময়, যে সরকারকে বিজেপি বাইরে থেকে সমর্থন করেছিল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রামমন্দির নির্মাণের উদ্যোগ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে স্থগিত রাখে। পুনরায় ১৯৯০-এর ৩০ অক্টোবর দিনটিকে রামমন্দির নির্মাণ শুরু করার অপরিবর্তনীয় দিন হিসেবে ঘোষণা করে ভি এইচ পি।

ইতিমধ্যে বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯০-এ সোমনাথ মন্দির থেকে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক রাম রথযাত্রা শুরু করেন। ২৩ অক্টোবর বিহার সরকার ভাগলপুরে সেই রথের চাকা থামিয়ে দেয় এবং আদবানিকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি কেন্দ্রের ভিপি সিং সরকারের উপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে।

১৯৯১ সালের লোকসভা নির্বাচনের ইস্তেহারে বিজেপি এই প্রসঙ্গে বলে ''বিজেপি বাবরি মসজিদ স্থানান্তরিত করে রামের জন্মস্থানে শ্রীরাম মন্দির নির্মাণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।''

১৯৯৬ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে তাদের ইস্তেহারে বিজেপি লিখল, ''আমরা ক্ষমতায় এলে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের সমস্ত বাধা সরিয়ে দেব...''। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর অটল বিহার বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার মাত্র ১৩ দিন ক্ষমতায় ছিল।

১৯৯৮-এ গঠিত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার ১৩ মাস টিকেছিল। ১৯৯৯-এ এন ডি এ পুনরায় ক্ষমতায় আসে। নয়া উদারনীতির রথ দেশবাসীর উপর চালাতে শুরু করে। তথাকথিত দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কারের নাম দেয় তাদের কর্মসূচীকে। ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত হয় শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক। মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে সংগ্রাম, আন্দোলন, ধর্মঘটে। ২০০৩ সালে লোকসভা নির্বাচনের এক বছর আগে আবার রামমন্দির ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসে বিজেপি। উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং সাধারণ মানুষের নজর ঘোরানো। ২০০৩-এ বিজেপির ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ সভায় এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, অযোধ্যা ইস্যুতে আইন এনে মিটিয়ে ফেলার বিষয়টি এন ডি এ-র সাধারণ এজেন্ডায় না থাকলেও বিজেপি মনে করে পালামপুরের (১৯৮৯) সভায় প্রস্তাবে গৃহীত পথই বিকল্প হতে পারে। সংসদে আইন এনে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে যদি এন ডি এ-র সফল সহযোগী ও বিরোধী দলগুলি বিশেষত কংগ্রেস এই প্রস্তাব সমর্থন করে।

বাজপেয়ী নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার ২০০৪ সালে লোকসভা ভোট এগিয়ে নিয়ে আসে। তথাকথিত 'সুশাসন'কে জাতীয় এজেন্ডা করে। নির্বাচনী ইস্তেহারে অযোধ্যা প্রসঙ্গে সেই সময় তারা বলেছিল যে দ্রুত এবং সর্বজনগ্রাহ্য প্রস্তাব গ্রহণ করা প্রয়োজন। আরো বলে যে, এই সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতের রায় সবার মেনে নেওয়া উচিত। নির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর সাহস পায়নি ২০০২-এর গুজরাট দাঙ্গার টাটকা রক্ত তখনও হাতে লেগে থাকা বিজেপির।

২০০৯-এর লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহারে রামমন্দির ইস্যুটিকে পুনরায় খুঁচিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয় ভারতের জনগণ ভীষণভাবে প্রত্যাশা করে যে অযোধ্যায় রামের জন্মস্থানে রামমন্দির স্থাপিত হোক। বিজেপি ক্ষমতায় এলে তা বাস্তবায়িত করার সবরকম প্রয়াস নেবে। ২০১৪-র নির্বাচনী ইস্তেহারে একই ধরনের কথা বলে বিজেপি।

আবার লোকসভা নির্বাচন আসন্ন। নির্বাচনের পূর্বে দেশবাসীকে দেওয়া কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেনি এনডিএ সরকার। তাই নির্বাচনের পূর্বে সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলতে রামমন্দির ইস্যু নিয়ে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে চাইছে আর এস এস। তাদের আইন তৈরি করে রাম মন্দির গঠনের উদ্যোগ নিক সরকার। ৯ ডিসেম্বর ২০১৮ দিল্লীতে হিন্দুত্ববাদীদের একটি সভায় বিজেপি এম পি রাকেশ সিনহা বলেছেন যে তিনি এই ইস্যুতে সংসদে প্রাইভেট মেম্বারস বিল আনবেন।

শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের উপর চরম দুর্দশা সৃষ্টিকারী বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের কোনো ছলচাতুরির কৌশল মানুষ আর গ্রহণ করছে না। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল এই নির্মম সত্য তুলে ধরেছে বিজেপির সামনে। তাই তাদের আবার বিভাজনের রাজনীতিকেই অস্ত্র করতে হচ্ছে। এজন্যই 'রামমন্দির' নামক আফিম দেশবাসীকে খাওয়ানোর প্রচেষ্টা শুরু করেছে আর এস এস-বিজেপি।

আর এস এস-বিজেপির কাছে সাম্প্রদায়িকতা হলো একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর মধ্য দিয়েই দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে ধ্বংস করে এই দেশটিকে 'হিন্দুরাষ্ট্রে' পরিণত করাই হলো ওদের একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যেই এই সাম্প্রদায়িক শক্তি ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছে। ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তুপের উপর রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চায় একই লক্ষ্য নিয়ে। নিজেদের ভোট ব্যাঙ্কে ধস নামার ইঙ্গিত সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের পূর্বেই টের পেয়েছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি। তাই ভোটের আগে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে নিয়োজিত ছিল গোটা সংঘ পরিবার। কেন্দ্র ও বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে অপশাসনের জেরে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। বিশেষত পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি ঘোরতর বিজেপি সমর্থকদেরও ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। এই ক্ষোভের আঁচ টের পেয়ে আর এস এস-বিজেপি ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তুপের উপর তথাকথিত 'রামমন্দির' তৈরির বিষয়টি নিয়ে আবার জল ঘোলা করতে শুরু করেছে। সুপ্রিম কোর্টকে তোয়াক্কা না করে অধ্যাদেশ জারি করার প্রচেষ্টা গ্রহণের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের কাজটি জোরদার করতে শুরু করেছে তারা। লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে এই প্রক্রিয়া আরো জোরদার হবে। শুধু 'রামমন্দির' নয় অন্যান্য সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক বিষয়গুলিকেও সামনে আনা হবে মেরুকরণের স্বার্থে। এই বিপজ্জনক প্রবণতা সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে এবং একে প্রতিরোধের লড়াইয়ে সামিল হতে হবে। □

নেলসন ম্যান্ডেলা— এক চলমান প্রত্যয়ের নাম

উৎসর্গ মিত্র

তখন কলেজে পড়ি। মনে আছে সে সময়ে যখনই মানুষের অধিকার নিয়ে কোনও মিছিল হতো, দুটো স্লোগান থাকতোই সে মিছিলে—''বেঞ্জামিন মোলায়েজকে ফাঁসী দেওয়া চলবে না'' আর ''নেলসন ম্যান্ডেলার নিঃশর্ত মুক্তি চাই।'' শুধু এ রাজ্যের ছাত্র-যুব-মহিলা-শ্রমিক-কর্মচারীরাই নন, এ দুটো দাবি নিয়ে গোটা পৃথিবীর মুক্তিকামী জনগণই সে সময়ে সোচ্চার ছিলেন। মোলায়েজের ফাঁসী আটকানো যায়নি। গোটা বিশ্বের জনমতকে অগ্রাহ্য করে মানুষের হয়ে কথা বলা দক্ষিণ আফ্রিকার কবি বেঞ্জামিন মোলায়েজকে ফাঁসিকাঠে চড়িয়েছিল সে দেশের বর্ণবৈষম্যবাদের ধারক, ঘৃণ্য পি ডবলু বোথার সরকার ১৯৮৫-র ১৮ অক্টোবর এক সাজানো মামলার রায়কে হাতিয়ার করে, কিন্তু এই ঘটনা ঘৃতাহুতি দিয়েছিল বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আর ম্যান্ডেলার মুক্তির দাবিতে গড়ে ওঠা গণ আন্দোলনে। ফলশ্রুতিতে বোথার উত্তরসূরি এফ ডবলু ডি ক্লার্ক বাধ্য হয়েছিলেন ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দিতে ১৯৯০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি। ২৭ বছর পর মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, ততদিনে যে কোনও দেশের মুক্তিকামী মানুষের লড়াইয়ের প্রেরণা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া নেলসন ম্যান্ডেলা। সেই নেলসন ম্যান্ডেলা, যাঁর নেতৃত্বে টানা লড়াই করে ঘৃণ্য বর্ণবৈষম্যবাদ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষরা ছিনিয়ে এনেছিল তাদের মুক্তি ... সে দেশের মানুষের কাছে যিনি শুধুই 'ম্যাডিবা'... তাঁদের রাজা!

দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সকি প্রদেশে এমবাশে নদীর তীরে একটা ছোট্ট গ্রাম এমভেজো। এখানেই জন্ম নেলসনের ১৯১৮ সালের ১৮ জুলাই। জন্মের সময়ে তাঁর নাম ছিল রোলিহ্লাহ্লা, তাঁর মাতৃভাষায় যার অর্থ 'গাছের ডাল টেনে নামনো'। কি ভেবে যে তাঁর এই নাম রাখা হয়েছিল কে জানে, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছিল এই ছেলেটি সার্থকনামা হয়ে উঠেছে—ডাল যতই শক্ত হোক না কেন (পড়ুন শত্রু যতই শক্তিশালী হোক না কেন) তাকে টেনে ঝুঁকিয়ে দেওয়াই হয়ে উঠেছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। পিতা গ্যাডলা হেনরি এমফাকানিসয়া ম্যান্ডেলা আদতে ছিলেন রাজ পরিবারের সন্তান, কিন্তু ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন স্থানীয় রাজার কৌঁসুলি। মা নোসকেনি ফ্যানি সাধারণ গৃহবধূ। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে বিবাদের কারণে পিতার পদ এবং চাকরি, দুটোই যখন খোয়া যায়, নেলসন তখন নেহাতই শিশু। বাধ্য হয়ে তাঁরা উঠে আসেন এমভেজোর উত্তরে আরও ছোটো এক গ্রাম কুইনুতে। এ এমনই এক জায়গা, যেখানে হাঁটা চলার জন্যে ঠিকমতো রাস্তা অবধি ছিল না, খাবার বলতে ছিল ভুট্টা, শালগম, কুমড়ো আর বীনস্... জল আসতো পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে। শিশু ম্যান্ডেলার খেলনা বলতে ছিল কাদামাটি আর গাছের শুকনো ডাল।

বংশে নেলসনই প্রথম মানুষ, যিনি স্কুলের চৌকাঠ ডিঙিয়েছিলেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর পিতার এক বন্ধুর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। তাঁরই পীড়াপীড়িতে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার পর নেলসনকে স্কুলে পাঠানো হয়। প্রথা অনুযায়ী এখানেই তাঁর নামকরণ হয় 'নেলসন'। তাঁর বয়েস তখন সাত। এর আগে পর্যন্ত তিনি তাঁর জন্মগত নামেই আত্মীয়দের কাছে পরিচিত ছিলেন। সম্ভবত সে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রভাবের জন্যই তাঁর এরকম ইংরাজি নাম রাখা হয়েছিল। স্কুলের বন্ধুদের সাথে আর পড়াশোনার ফাঁকে পশু চারণে এ সময়টা তাঁর খারাপ যাচ্ছিল না, কিন্তু বিপদে পড়লেন যখন তাঁর নয় বছর বয়েসে হঠাৎ করেই পিতার মৃত্যু ঘটল। ঠিক কি কারণে যে তাঁর মৃত্যু ঘটলো, সেটা ডাক্তাররা ধরতে পারেননি, কিন্তু নেলসন বিশ্বাস করতেন তাঁর পিতা ফুসফুসের অসুখেই মারা গিয়েছেন। যেটাই হোক, এই মৃত্যু তাঁর জীবনকে আমূল বদলে দিয়েছিল। তাঁদের এই বিপদের দিনে এগিয়ে এলেন জঙ্গিস্তাবা দালিন্দেবো নামে এক ভদ্রলোক। থেম্বু জনগণের স্থানীয় প্রশাসক এই ভদ্রলোক দত্তক নিলেন নেলসনকে। ক্ষমতায় থাকাকালীন কোনও এক সময়ে নেলসনের পিতা এই ভদ্রলোকের নাম স্থানীয় প্রশাসকের পদের জন্যে সুপারিশ করেছিলেন। সেদিন বিপদের সময়ে নেলসনকে দত্তক নিয়ে তিনি সেই ঋণ শোধ করলেন।

দালিন্দেবোর দত্তক পুত্র হওয়ার কারণে নেলসনকে কুইনুর মুক্ত জীবন ছেড়ে চলে যেতে হলো থেম্বুল্যাণ্ডের রাজধানী শহর মাকিজেওয়েনিতে। এখানে বাস একেবারে রাজপ্রাসাদে। নেলসন যদিও তাঁর প্রিয় গ্রাম কুইনুকে কোনোদিন ভোলেননি, তবু তার জন্যে হা-হুতাশ না করে নতুন জীবনের সাথে দ্রুত মানিয়ে নিয়েছিলেন এবং দ্রুত নিজেকে সেই জীবনের যোগ্য করে তোলার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। দালিন্দেবো মানুষটা ছিলেন ভালো। তাঁর দুই পুত্র-কন্যার সাথে নেলসনকে কোনোদিন আলাদা করে দেখেননি তিনি। তাই নিজের ছেলে-মেয়ের সাথে নেলসনকেও তিনি একই স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। স্থানীয় ভাষার সাথে ইংরাজি, ইতিহাস ও ভুগোল নিয়ে এখানে পড়তে পড়তেই বিশেষ করে আফ্রিকার ইতিহাস তাঁকে খুবই আকৃষ্ট করে। ইতিহাস থেকেই তিনি জানতে পারেন যে এক সময়ে আফ্রিকার সমস্ত শিশুই পরস্পরের ভাই-বোন হিসেবে বেড়ে উঠতো, কিন্তু হঠাৎ করে একদিন সাদা চামড়ার লোকেরা এসে সব গণ্ডগোল করে দিল। সরল মনে আফ্রিকানরা তাদের দেশের জমি, বাতাস, জল সাদা চামড়ার লোকদের সাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল বিশ্বাসঘাতক সাদা চামড়ারা তাদের নিজেদের ভাগের সাথে আফ্রিকানদের সমস্ত কিছুও দখল করে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে দিল। নেলসন বুঝেছিলেন, এদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে না পারলে আফ্রিকানদের মুক্তি নেই এবং তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন।

আফ্রিকানদের রীতি অনুযায়ী ১৬ বছর বয়েস হলে ছেলেদের সুন্নৎ করতে হয়। সুন্নৎ করা না থাকলে কোনও আফ্রিকান তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন না শুধু নয়, তিনি বিবাহ করতে পারেন না, এমনকি কোনও শুভ অনুষ্ঠানে হাজির পর্যন্ত থাকতে পারেন না। এক কথায় তিনি সমাজে ব্রাত্য হিসেবে গণ্য হতে থাকেন। নিজে এ ব্যাপারটায় খুব উৎসাহিত না থাকলেও, যেহেতু এই রীতিটা আসলে এক সাধারণ ছুরি-কাঁচির অনুষ্ঠান না হয়ে তার সাথে একটা বড়ো অনুষ্ঠানের ব্যাপার এবং এই সময়টায় যেহেতু বহু কম বয়সী আফ্রিকানকে এক জায়গায় পাওয়া যায়, সেহেতু এই সুযোগটা তিনি ছাড়তে চাননি। সুন্নতটা তাঁর আর করা হয়নি শেষ মুহূর্তে মতের পরিবর্তন ঘটায়, কিন্তু পুরো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছিলেন তিনি। সেখানে প্রধান বক্তা ছেলেদের সামনে কথা প্রসঙ্গে সাদা চামড়ার লোকদের হাতে কিভাবে কালো চামড়ার মানুষেরা অত্যাচারিত হচ্ছে, তার নানা উদাহরণ দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, যেহেতু কালোদের সমস্ত জমিই সাদা চামড়ার দখলে, সেহেতু কালোরা কোনোদিনই স্বাধীনতার স্বাদ আর ভোগ করতে পারবে না এবং দেশের যুব সমাজের জীবন

সাদাদের খিদমত খাটতে খাটতেই কেটে যাবে। অনেক পরে নেলসন বলেছিলেন, সেদিন বক্তার সমস্ত কথাই যে তাঁর বোধগম্য হয়েছিল এমনটা নয়, কিন্তু তাঁর সেদিনের বক্তব্য নেলসনের মনে এক গভীর ছাপ ফেলে গেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল কালো মানুষের মুক্তির জন্যে সমস্তরকম কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা উচিত।

রাজপরিবারের সন্তান হিসেবে নেলসনের ঠাঁই হলো ওয়েসলিয়ন মিশন স্কুলে। প্রথমে ক্লাসের ছেলে-মেয়েরা তাঁকে ''গাঁয়ের ছেলে'' বলে ঠাট্টা করলেও পরে কিন্তু তাদের অনেকেই তাঁর বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। এখানে লেখাপড়ার পাশাপাশি এথলেটিক্স আর বক্সিং-এর চর্চাও চলতে থাকলো জোর কদমে। ১৯৩৯-এ ভর্তি হলেন ইউনিভার্সিটি অফ ফোর্ট হেয়ার-এ। সে সময়ে আফ্রিকায় এই প্রতিষ্ঠানটিকে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বা হাভার্ডের সাথে তুলনা করা হতো। সাব-সাহারান দেশগুলির মেধাবী ছাত্ররা এসে ভিড় জমাতেন এই প্রতিষ্ঠানে। দালিন্দেবোর ইচ্ছে ছিল নেলসনও তাঁর পিতার মতো রাজার কৌঁসুলি হোন। সেই মোতাবেক ইউনির্ভাসিটির প্রথম বর্ষে নেলসনের বিষয় নির্বাচনও হয়ে গেছিল, কিন্তু নেলসনের নিজের ইচ্ছে ছিল সরকারের উচ্চ পদে যোগ দেওয়ার। এ কারণে তিনি জোর দিলেন রোমান-ডাচ আইন শাস্ত্রের ওপর। এদিকে এখানে পড়াশোনার সাথে রাজনীতিও এসে গিয়েছে তাঁর জীবনে। দ্বিতীয় বর্ষে হলেন সেখানকার স্টুডেন্ট রিপ্রেসেন্টেটিভ (এস আর) কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য। সেই সময়ে ছাত্ররা ইউনিভার্সিটিতে খাবারের মানের উন্নতি এবং এস আর-এর হাতে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়ার দাবিতে বয়কট আন্দোলন চালাচ্ছিল। সে লড়াইকে আরও বেশি গতিশীল করতে এক সময়ে নেলসন তাঁর নির্বাচিত পদ থেকে ইস্তফা দেন। এই পদক্ষেপকে চরম 'অবাধ্যতা' বিচার করে কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেই বছরের জন্যে সাসপেন্ড করে এবং জানিয়ে দেয় যে বৎসরান্তে এস আর-এর কাজকর্ম নিঃশর্তে চালিয়ে যাওয়ার মুচলেকা দিলে তবেই তিনি ক্লাসে যোগ দিতে পারবেন। নেলসন বাড়ি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

স্বাভাবিকভাবেই দালিন্দেবো তাঁর এই সিদ্ধান্ত ভালোভাবে নেননি। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে নেলসনকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং ফের বিশ্ববিদ্যালয়তেই ফিরে যেতে হবে। নেলসনের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই দেখে অবশেষে দালিন্দেবো ঠিক করলেন এবারে ছেলের বিয়ে দিয়ে তাঁকে সম্পত্তির ভাগ বুঝিয়ে দেবেন, তাঁর জীবনটা আর পাঁচজনের ছেলের মতো গুছিয়ে দেবেন। নেলসন দেখলেন তিনি ফাঁদে পড়েছেন। একবার সংসারের মধ্যে ঢুকে গেলে কালো মানুষের মুক্তির যে স্বপ্নকে সফল করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবেন ঠিক করেছিলেন, সেটা আর শুরুই করতে পারবেন না। তিনি ঘর ছাড়লেন, বলা ভালো পালিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে, গিয়ে উঠলেন সোজা জোহানেসবার্গে। এখান থেকে করেসন্ডেন্সে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা চালানোর পাশাপাশি অর্থ যোগাড়ের জন্যে এই সময়টায় তাঁকে নানা কাজ করতে হয়েছে, এমনকি সারাদিন পড়াশোনার পরে রাতে পাহারাওয়ালার কাজ পর্যন্ত তাঁকে করতে হয়েছে বেশ কিছুদিন। স্নাতক হওয়ার পর তিনি ভর্তি হয়েছিলেন জোহানেসবার্গেরই ইউনিভার্সিটি অফ উইটওয়াটারস্রান্ড-এ আইন পড়ার উদ্দেশ্যে। এখানে তিনিই ছিলেন একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র। ফলে তাঁকে অন্যান্য সাদা চামড়ার ছাত্রদের কাছ থেকে কটূক্তি শুনতে হয়েছে। তবু এর মধ্যে বেশকিছু মুক্তমনা বন্ধুও জুটে গিয়েছিল তাঁর। তাঁরা সবাই-ই যে কালো চামড়ার ছিলেন, এমন নয়। এঁদের মধ্যে যেমন ইহুদিরা ছিলেন, তেমনই ছিলেন ভারতীয় বা ইউরোপীয়ও এবং সবাই-ই ছিলেন কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন। তাঁর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া এইখানে পড়তে পড়তেই। আগস্ট, ১৯৪৩-এ সরকার হঠাৎ করেই বাসের ভাড়া বেশ কিছুটা বাড়িয়ে দেয়। এ এন সি ডাক দেয় বাস বয়কটের। ছাত্ররাও শামিল হয় এই বয়কট আন্দোলনে। সেদিন বয়কটের সমর্থনে ছাত্রদের যে বিশাল মিছিল সরকারি দপ্তরের দিকে এগিয়ে যায়, তার নেতৃত্বে ছিলেন নেলসন। বয়কটের ব্যাপকতায় সরকার বাধ্য হয়েছিল বর্ধিত বাস ভাড়া প্রত্যাহার করে নিতে।

ঐ সময়েই আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (এ এন সি) নেতৃত্বে বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে নেলসন পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েন। সে সময়ে এ এন সি-র ভিতরে বেশ কিছু তরুণ আফ্রিকান মনে করতো বিভিন্ন দাবিতে সরকারের কাছে শুধুমাত্র পিটিশন দাখিলের মধ্যে দিয়ে লড়াই-আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার যে পুরনো কায়দায় এ এন সি চলছে, তার দ্বারা আর যাইহোক, কালো মানুষের মুক্তি আদায় সম্ভব না। তারা মনে করতো, এ এন সি-কে যদি মানুষের জন্যে লড়তেই হয়, তাহলে মানুষের মধ্যে থেকেই তাকে শক্তি অর্জন করতে হবে। সাদা চামড়ার অত্যাচারের মধ্যে পড়ে যে সমস্ত কালো মানুষ তাদের কথা বলার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছে, তাদের কথা বলার শক্তি যোগাতে হবে। সম-মানসিকতার হওয়ার জন্য এরা নিজেদের মধ্যে একটা গ্রুপ তৈরি করে ফেলেছিল, যারা নিজেদের বলতো 'আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস ইউথ লীগ'। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এন্টন লেম্বেডে। নেলসন হয়ে গেলেন এদেরই একজন। এদেরই চাপে পড়ে ১৯৪৯ সাল নাগাদ এ এন সি তাদের লড়াইয়ের ধারা বদলাতে বাধ্য হয়। শুরু হয় কালো মানুষদের জন্যে পূর্ণ নাগরিক অধিকার, কৃষি জমির পুনর্বন্টন, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদির মতো নীতিগত বিষয় নিয়ে দেশব্যাপী বয়কট, ধর্মঘট, আইন অমান্য, অসহযোগ ইত্যাদি আন্দোলন। এইসব আন্দোলন সফল করতে এ এন সি সিদ্ধান্ত নেয় বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলকে একত্রিত করার। বেশকিছু ক্ষেত্রে সফলও হয় তারা। কিছু রাজনৈতিক গোষ্ঠী আবার তাদের স্বাতন্ত্র্য বাজয় রেখেই সরাসরি যোগ দেয় এ এন সি-তে।

১৯৪৩-৪৪ সাল নাগাদ এ এন সি-তে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, ওয়াল্টার সিসুলু তাঁদের অন্যতম। নেলসন এবং তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু অলিভার টম্বোর ওপর এই সিসুলুর অসম্ভব প্রভাব ছিল। মনে-প্রাণে সমাজতন্ত্রী সিসুলু তাঁর মত ব্যক্ত করতেন খোলাখুলি ভাবেই। দিনের এক বড়ো অংশ তাঁরা সিসুলুর বাড়িতেই কাটাতেন। এখানেই তাঁর সাথে পরিচয় হয় এ এন সি-র কর্মী ইভেলিন মেজ-এর। অক্টোবর, ১৯৪৪-এ তাঁরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হ'ন। দুটি কন্যাও হয় তাঁদের।

সিসুলুর প্রতি পূর্ণ অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও নেলসন কিন্তু ঝুঁকে থাকতেন লেম্বেডের প্রতি কারণ লেম্বেডের মতো নেলসনও বিশ্বাস করতেন লড়াই করে কালোদের জন্যে স্বাধীনতা শুধু কালোরাই আনতে পারে, আর কারোরই তাদের প্রতি আন্তরিকতা থাকা সম্ভব না, এমনকি কমিউনিস্টদেরও না। '৪৭-এর জুলাইতে লেম্বেডের হঠাৎ মৃত্যুতে তাঁর জায়গায় ইউথ লীগের যিনি সভাপতি হলেন, সেই পিটার এমডা ছিলেন উদার নীতির সমর্থক, অর্থাৎ উপনিবেশবাদকে খতম করতে তিনি সমমনস্ক অ-কৃষ্ণাঙ্গ এবং কমিউনিস্টদের সাথে কাজ করতেও পিছপা ছিলেন না। নেলসন তখন লীগের সেক্রেটারি। শুধু এই একটা কারণেই নেলসনের সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। সে দ্বন্দ্ব এতটাই তীব্র হয়েছিল যে, বছরের শেষে নেলসন প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন লীগ থেকে কমিউনিস্টদের তাড়িয়ে দিতে, কিন্তু সফল হননি। ওই বছরেই এ এন সি-র ট্রান্সভাল প্রভিন্স শাখার কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। কিন্তু সেখানেও বিরোধ বাধে। শাখার সভাপতি রামোহানো যখন শাখার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে ভারতীয় এবং কমিউনিস্টদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হ'ন, তখন শুধু তার বিরোধিতাই নয়, তাঁকে পদত্যাগে পর্যন্ত বাধ্য করেন নেলসন।

সরকারের সাথে এ এন সি-র বিরোধ চরমে উঠলো ১৯৪৮ সালে সে দেশে সাধারণ নির্বাচনের পর। বর্ণবৈষম্যের কারণে তখন কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার ছিল না। নির্বাচনের ফলাফলে যিনি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসেন, সেই ড্যানিয়েল মালান ছিলেন ভয়ঙ্কর বর্ণবাদী। স্বভাবতই সরকারে এসেই তিনি উদ্যত হ'ন বর্ণবৈষম্যের পরিধিকে আরও অনেক দূর বাড়িয়ে নিতে। এ এন সি-র প্রভাবশালী নেতা হিসেবে নেলসন ডাক দিলেন সরকারের সাথে সরাসরি সংঘর্ষের। ডাক দিলেন ব্যাপকতম বয়কট ও ধর্মঘটের। এ এন সি-র তৎকালীন সভাপতি এক্সুমা এর বিরোধিতা করলে তাঁকেও পদচ্যুত করা হলো। গঠিত হলো আরও জঙ্গি মনোভাবাপন্ন কার্যকরী সমিতি, যার সদস্য হলেন সিসুলু, এমডা, টম্বোর মতো লোকেরা। কিন্তু এতো কিছু করতে গিয়ে আইন পরীক্ষাটাই তাঁর ভেস্তে গেল। বারবার তিনবার সে পরীক্ষায় ফেল করায় ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল যে তিনি আর পরীক্ষায় বসতে পারবেন না।

ভ্রুক্ষেপ করলেন না নেলসন, সংগঠনের কাজ চললো পুরো দমে। ফলে পরের বছর মার্চ মাসে এ এন সি-র জাতীয় কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হলেন তিনি এবং ওই একই বছরে ইউথ লীগের জাতীয় সভাপতিও নির্বাচিত হয়ে গেলেন। ওই মাসেই বাকস্বাধীনতা রক্ষার শপথ নিয়ে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় জোহানেসবার্গে। সেখানে এ এন সি-র সাথে আফ্রিকান, ভারতীয় এবং কমিউনিস্টরাও জড়ো হয়েছিলেন কনভেনশনে অংশ নিতে। কনভেনশন শেষে বর্ণবৈষম্য এবং সংখ্যালঘু সাদা চামড়ার লোকদের শাসনের অবসানের আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে ডাক দেওয়া হয় পয়লা মে দেশব্যাপী ধর্মঘটের। নেলসন-এর বিরোধিতা করেন আহ্বায়করা সবাই কালো চামড়ার ছিল না বলে এবং এ এন সি এই ধর্মঘটের নেতৃত্বে ছিল না বলে। তা সত্ত্বেও দেশের অধিকাংশ কালো শ্রমিক এই ধর্মঘটে যোগ দেন, ধর্মঘট সফল হয়ে যায় পূর্ণ মাত্রায়। শাসকশ্রেণী তার দাঁত, নখ, নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্দোলনের ওপর। দেশে চালু হয় কুখ্যাত 'সাপ্রেশন অফ কমিউনিস্ট এ্যাক্ট, ১৯৫০'। কিন্তু এতে সমস্ত কালো মানুষকে এক করার রাস্তা খুলে যায়। নেলসন তখনও লড়াইতে নানা বর্ণের সংরক্ষণের বিরুদ্ধে। কিন্তু তিনিও ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে এ এন সি-র জাতীয় কনফারেন্সে এক-বর্ণিক লড়াইয়ের স্বপক্ষে বলতে গিয়ে পরাজিত হয়ে যান। সম্মেলন সিদ্ধান্ত নেয় বহু-বর্ণিক লড়াইকে জোরদার করার।

▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

ষষ্ঠ জাতীয় মহিলা কনভেনশন

গীতা দে

সুতপা হাজরা

দেবলা মুখার্জি

কনভেনশনে পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধি

সারা ভারত রাজ্য সরকারী ফেডারেশনের উদ্যোগে ষষ্ঠ জাতীয় মহিলা কনভেনশন গত ২৯-৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮, মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই কনভেনশনকে কেন্দ্র করে কনভেনশন স্থলের নামকরণ হয়েছিল কমঃ সুকোমল সেন নগর, মঞ্চের নামকরণ হয়েছিল কমঃ মুথুসুন্দরম মঞ্চ। সারা ভারতবর্ষের ১৯টি রাজ্য থেকে ২৭৯ জন প্রতিনিধি এই কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে ১৭ জন প্রতিনিধি এই কনভেনশনে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ২৯ডিসেম্বর১৮ ঠিক সকাল ১০টায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের এক বর্ণাঢ্য মিছিল সংলগ্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে কনভেনশনের মূল কাজ শুরু হয়। কনভেনশন উদ্বোধন করেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সহ সভানেত্রী কিরণ মোগে। তিনি উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন নব্য উদারনীতির সার্বিক আক্রমণের শিকার হচ্ছেন মহিলারা। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামাজিক বৈষম্য। ফলে মহিলারা পিছিয়ে পড়ছেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প, ফ্যাসীবাদী আক্রমণে মহিলারা বেশি আক্রান্ত। চাই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। আগামী সর্বভারতীয় ধর্মঘট শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এক নতুন পথের দিশা দেখাবে। কনভেনশনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার। বিভিন্ন রাজ্য থেক্কে মোট ৩৫ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য রাখেন গীতা দে ও দেবলা মুখার্জী। কনভেনশনে সর্বজনীন গণবণ্টন ব্যবস্থা চাঙ্গস করা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রস্তাব রাখেন জাতীয় কার্যকরী কমিটির সদস্যা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি সুতপা হাজরা। পরিশেষে কনভেনশনে সমস্ত আলোচনার জবাবী ভাষণ দেন এ. শ্রীকুমার। ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সুভাষ লাম্বা। ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে কনভেনশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। □

রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচারে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা

প্রশাসনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সারা রাজ্যেই হয়েছে জোরদার প্রচার।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি

রাজ্য সরকারের রক্ত চক্ষু ও ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে ৮ ও ৯ জানুয়ারি ২০১৯ যারা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। চরম আর্থিক বঞ্চনা এবং প্রশাসনিক স্বৈরাচারের প্রতিবাদে যাঁরা কোনো না কোনো কারণে ধর্মঘট করতে পারলেন না তাঁদের সহ সব কর্মচারীদের আগামী দিনে দেশের ও রাজ্যের স্বার্থে এবং সীমাহীন আর্থিক বঞ্চনার প্রতিবাদে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যুক্ত হওয়ার জন্যে এখন থেকেই সর্বত্র প্রস্তুতি নেওয়ার আবেদন করছি।

বিজয় শঙ্কর সিংহ
সাধারণ সম্পাদক
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

সমিতি সম্মেলন

গত ৫-৬ জানুয়ারি ২০১৯, **ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভে এ্যান্ড ড্রইং এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের** ৬৯-৭০তম রাজ্য সম্মেলন কমরেড সুকোমল সেন নগর (কৃষ্ণনগর), কমরেড প্রভাত দাস মঞ্চে (সমিতি ভবন) কৃষ্ণনগর, নদীয়া সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়। রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে ৪ জানুয়ারি '১৯ সন্ধ্যায় প্রগতিশীল সাহিত্য বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব প্রবীর মুখার্জী। তিনি বলেন, বর্তমানে সারা বিশ্বের বামপন্থার উপর আক্রমণ চলছে। স্বাভাবিকভাবেই বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নেরকর্মী হিসাবে আমাদের মতাদর্শ চর্চা ও পুস্তক পাঠের অভ্যাস আরো বৃদ্ধি করতে হবে। মতাদর্শকে ভিত্তি করে ইস্পাত দৃঢ় সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

৫ জানুয়ারি সকালে প্রায় দুই শতাধিক প্রতিনিধির সুসজ্জিত, সুশৃঙ্খল, স্লোগান মুখরিত উদ্দীপ্ত মিছিল কৃষ্ণনগর শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের কর্মসূচী সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। অতঃপর প্রভাত দাস মঞ্চে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সন্দীপ মুখার্জী, তাপস ভট্টাচার্য, সুশ্রী মণ্ড, ও মধুমিতা চ্যাটার্জীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী দু'দিনের সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন।

৭০টি লাল বৈদ্যুতিন আলো প্রজ্জলিত করে রাজ্য সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অসিত ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, সংগঠন পরিস্থিতি নিরপেক্ষ নয়। পরিস্থিতি চাহিদা অনুযায়ী মজবুত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতি পরিবর্তন করে শ্রমজীবী মানুষের অনুকুল পরিস্থিতি তৈরীর জন্য সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ৮ ও ৯ জানুয়ারি '১৯ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানান। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অজিত বিশ্বাস এবং নদীয়া জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সুধন্য সরকার। সম্মেলনে প্রধান অতিথি প্রবীর মুখার্জী সমিতির মুখপত 'সংগঠনের দিশারী'-র বিশেষ সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। উদ্বোধনী সভার পর প্রতিনিধি অধিবেশন শুরু হয়। প্রতিনিধি অধিবেশনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক মৌলিনাথ মুখার্জী, আয় ও ব্যায়ের হিসাব পেশ করেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ সুশান্ত বিশ্বাস। খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন সহ-সম্পাদক শ্রীকান্ত মাইতি। ৮ ও ৯ জানুয়ারি '১৯ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব পেশ করেন পত্রিকা সম্পাদক সোমনাথ হালদার। খসড়া প্রস্তাবাবলী ও ধর্মঘটের প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সহ-সম্পাদক সুব্রত দেব এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রদ্যুৎ সরকার।

দেশে বর্তমান সাম্প্রদায়িকতা, পরিচিতি সত্ত্বার রাজনীতির বিপদ ও তার থেকে উত্তরণ এবং সাংগঠনিক দায়-দায়িত্ব বিষয়ে মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চন্দন ঘোষ। সম্মেলনে উত্থাপিত প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাবের উপর ২ জন মহিলা সহ মোট ২১ জন প্রতিনিধি অত্যন্ত গঠনমূলক বক্তব্য রাখেন। সমগ্র আলোচনা গুটিয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন নাহা তাঁর জবাবী ভাষণ দেন। খসড়া প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, খসড়া প্রস্তাবাবলী ও ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে স্বপন নাহা সভাপতি, মৌলিনাথ মুখার্জী সাধারণ সম্পাদক, সুশ্রী মণ্ডল যুগ্ম সম্পাদক, বিশ্বজিৎ দাস কোষাধ্যক্ষ সহ ৬৩ জনের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি এবং আমন্ত্রিত সহ মোট ১৯ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত হয়। সভাপতিমণ্ডলীরপক্ষ থেকেসন্দীপ মুখার্জী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আন্তর্জাতিক সংগীতের মধ্য দিয়ে সমিতির ৬৯-৭০ তম রাজ্য সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। □

কমরেড প্রবীর দাশগুপ্তের স্মরণসভা

স্মরণসভায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর একাংশ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পুরুলিয়া জেলা শাখার আহ্বানে কর্মচারী আন্দোলনের পুরোধা নেতৃত্ব প্রয়াত কমরেড প্রবীর দাশগুপ্তর স্মরণসভা পুরুলিয়া কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত হয় গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে। প্রয়াত কমরেড প্রবীর দাশগুপ্তর স্মরণ সভায় তাঁর প্রতিকৃতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। স্মরণসভায় প্রথমেই শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক লাল মোহন গ্রহাচার্য। পরবর্তীতে স্মৃতিচারণ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য চুনীলাল মুখার্জি, রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব প্রবীর মুখার্জি, জেলার কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব নারায়ণ প্রসাদ সিংহ দেও, অনিল বিশ্বাস, বাঁকুড়া জেলার কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব প্রণব মুখার্জি, পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদীপ ঘোষ, জেলা নেতৃত্ব সতীনাথ মুখার্জি, ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক প্রচেতা কুমার দাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির জেলা সম্পাদক পার্থ বিজয়া মাহাতো, প্রয়াত কমরেড প্রবীর দাশগুপ্তর সুযোগ্যা সহধর্মিনী দেবপূর্ণা মজুমদার (দাশগুপ্ত) ও ভ্রাতা প্রতীপ দাশগুপ্ত প্রমুখ।

সংগ্রামী হাতিয়ার মুখপত্রের প্রাক্তন সম্পাদক প্রেরিত শোকবার্তা পাঠ করেন এবং মাল্যদানের কর্মসূচী পরিচালনা করেন সহসম্পাদক রামাশীষ অধিকারী। স্মরণসভা পরিচালনা করেন জেলা সভাপতি শ্যামসুন্দর বসু ও সহ-সভাপতি অজিত মাহাতো। দুই শতাধিক কর্মচারী স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। □

সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে বিক্ষোভ কর্মসূচী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির আহ্বানে আগামী ৮-৯ জানুয়ারি ২০১৯-এর সর্বভারতীয় ধর্মঘটের সমর্থনে জেলা জমায়েত-এর কর্মসূচী বিগত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ বেলা ২টায় আলিপুর ডাকঘর-এর সামনের রাজপথে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা জমায়েত-এ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব উথাপন করেন কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা যুগ্ম সম্পাদক রজত সাহা। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুভাষ সর্দার এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক অঞ্জন বসু। সমাবেশে উপস্থিত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক দেবব্রত রায় জেলার কর্মচারীদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। কাকদ্বীপ থেকে ক্যানিং, ভাঙড় থেকে বিষ্ণুপুর গোটা জেলা থেকে উপস্থিত প্রায় ছয় শতাধিক কর্মচারী শপথ গ্রহণ করেন ৮-৯ জানুয়ারি সর্বভারতীয় ধর্মঘটকে সার্বিক সফলতার শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার। সমাবেশ পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সভাপতি দেবাশীষ ব্যানার্জী ও অন্যতম সহ-সভাপতি কৃষ্ণা দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সমাবেশের প্রাক্কালে পেনশনার্স সমিতির প্রায় দুই শতাধিক সদস্য ধর্মঘটের সমর্থনে এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃবর্গের অনৈতিক বদলীর বিরুদ্ধে মিছিল সংগঠিত করেন আলিপুর ডিএম অফিস চত্বরে। □

▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন

দূরদূরান্তে বদলী করা হয়েছে, তার তথ্যও মাননীয় রাজ্যপালের সামনে তুলে ধরা হয়। সামগ্রিক বক্তব্য শুনে মাননীয় রাজ্যপাল উষ্মা প্রকাশ করেন। তাঁর সুবিবেচনার জন্য প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানান হয়।

রাজ্যের প্রশাসনিক, সাংবিধানিক কাঠামোকে যেভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে, তাতে মাননীয় রাজ্যপালের পরামর্শ রাজ্য প্রশাসন আদৌ গুরুত্ব দেবে কি না তার অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। তবে এই সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে মাননীয় রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন এবং ছুটির পর রাজ্যজুড়ে ধিক্কার মিছিলের সফল কর্মসূচী রাজ্যের শাসক দলের কর্মচারী স্বার্থবিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নতুন শক্তি জোগাবে।

অফিস ছুটির পর কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়্যার থেকে একটি সুসজ্জিত শ্লোগান মুখরিত বৃহৎ মিছিল রাজভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মিছিলের সামনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, সভাপতি এবং বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। মিছিল ধর্মতলায় পৌঁছলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় ১৪৪ ধারা জারি থাকার জন্য মিছিল নিয়ে রাজভবনের কাছে পৌঁছনো যাবে না। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ তখন সিদ্ধান্ত নেন যে, লেনিন মূর্তির পাদদেশে সভা করা হবে। ঐ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ এবং বাম পরিষদীয় দলনেতা ড. সুজন চক্রবর্তী। উভয় বক্তাই রাজ্যপালের সাথে আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন এবং ৮-৯ জানুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে দপ্তরে দপ্তরে ব্যাপক প্রচার প্রস্তুতি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

নেলসন ম্যান্ডেলা

যাই হোক, নেলসন চেয়েছিলেন ন্যূনতম রক্তপাতের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে। সে কারণেই প্রথমদিকে তিনি এম কে-র কাজকে সেনা বাহিনীর টেলিফোন লাইন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদিকে বানচাল করে দেওয়ার মতো অন্তর্ঘাতমূলক কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, কারণ এতে সবচেয়ে কম রক্তক্ষয় হয় এবং সরকারকে ধাক্কা দেওয়া যায়। কিন্তু এটাও তিনি বুঝেছিলেন যে এই প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে গেরিলা যুদ্ধ ছাড়া আর কোনও পথ তাঁদের খোলা নেই। সে কারণেই আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সিম্পোসিয়াম ইত্যাদিতে যোগ দেওয়ার অছিলায় তিনি বেড়িয়ে পড়েন তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশে। সাড়া পাওয়া যায় অভূতপূর্ব। অস্ত্র কেনার জন্য একা তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানই দেন ৫,০০০ পাউন্ড। একইভাবে অর্থ সংগ্রহ হয় ইথিওপিয়া, ইজিপ্ট, মরক্কো, মালি, গিনি, সিয়েরা লিয়ন, লাইবেরিয়া, সেনেগাল ইত্যাদি দেশ থেকেও। এরপর তিনি যান ইংল্যান্ডে বিশ্ব দরবারে নিজেদের কার্যক্রম তুলে ধরতে এবং তারপর ফের চলে আসেন ইথিওপিয়ায়, গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য। দেশ থেকে পার্টি নেতৃবৃন্দের জরুরী তলব পেয়ে ফিরে আসতে হওয়ায় এ প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করতে পারেননি তিনি।

দেশে ফেরার অল্প দিনের মধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় সরকারকে না জানিয়ে দেশের বাইরে যাওয়া এবং ফিরে এসে ধর্মঘট করতে শ্রমিকদের উস্কানোর অপরাধে। সেটিকে ব্যবহার করেন তাঁর রাজনৈতিক প্রচারের মঞ্চ হিসাবে। বিচারে তাঁর পাঁচ বছরের জেল হয়। তাঁকে যখন জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন বাইরে তাঁর সমর্থকরা গাইছেন সেই বিখ্যাত গান, ''নিকোসি সিকেলে আফ্রিকা'' ... আফ্রিকাকে শৃঙ্খল মুক্ত করো ...

কারাবাসের সময়েই পুলিশ এম কে-র দপ্তরে হানা দিয়ে প্রচুর কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে এবং ব্যাপক ধরপাকড় চালায়। এর ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত, ষড়যন্ত্র ও জোর করে সরকারকে উৎখাত করার প্রক্রিয়ায় লিপ্ত থাকার অপরাধে পুলিস নতুন আরও একটা মামলা রুজু করে। যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায় বিচারক প্রথমে মামলা নিতে চাননি, কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটার নতুন করে আরও বেশি পরিমাণে সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগাড় করলে '৬৪-র ফেব্রুয়ারিতে ফের মামলা শুরু হয়। এই শুনানিকেও নেলসন তাঁর প্রচারের কাজে ব্যবহার করেন। ফিদেলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শুনানির সময়ে তিন ঘণ্টার এক রোমহর্ষক বক্তৃতা দেন তিনি, যা সারা বিশ্বে সাড়া ফেলে দেয়। নেলসনের মুক্তির দাবিতে গোটা পৃথিবীতেই আওয়াজ উঠতে থাকে। 'নিকোসি সিকেলে আফ্রিকা' বিশ্ববাসীর সঙ্গীতে পরিণত হয়। এমনকি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং বিশ্ব শান্তি সম্মেলনও নেলসনের সমর্থনে সাওয়াল করতে শুরু করে। তবু নেলসনের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এবার কারাদণ্ড যাবজ্জীবনের। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় রবেন আইল্যান্ডের কারাগারে, ঠাঁই হয় আট ফুট বাই সাত ফুটের এক স্যাঁতসেঁতে কুঠুরিতে। দিনেরবেলায় এখানে তিনি চুনাপাথর ভাঙতেন আর রাতে চালিয়ে যেতেন তাঁর নিজস্ব কর্মীদের জন্যে অন্যকিছু শিক্ষিত বন্দীর সাথে মিলে গড়ে তুললেন 'ইউনিভার্সিটি অফ রবেন আইল্যান্ড'। জেলে বসেই তিনি শুনতে পান মা এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর খবর। কোনও শেষকৃত্যেই উপস্থিত থাকার অনুমতি মেলেনি তাঁর, কচিৎ দেখা হতে পারতো স্ত্রীর সঙ্গে আর কারাবাসের এগারো বছরের মাথায় দেখতে পেরেছিলেন কন্যাকে।

এত কিছুতেও দমানো যায়নি নেলসনকে, জেলে বসেই চালিয়ে গেছেন আন্দোলনের কাজ, সংগঠনের কাজ। তাঁর এইসব কাজের স্বীকৃতি দিয়েছে সে সময়ে বহু স্বাধীন দেশ তাঁকে নানা উপাধিতে ভূষিত করে, যাদের মধ্যে ভারতও ছিল। প্রায় সব দেশই বারে বারে সোচ্চার হয়েছে তাঁর মুক্তির দাবিতে। শুধুমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার তখনকার ঘৃণ্য সরকারের দুই পরম মিত্র রোনাল্ড রেগন আর মার্গারেট থ্যাচার কোনও দিনই চাননি নেলসন মুক্তি পান, কারণ সমস্ত কিছুর পরেও তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন নেলসন একজন সন্ত্রাসবাদী এবং তিনি মুক্তি পেলে আসলে জয় হবে কমিউনিস্টদেরই।

শয়তানেররা কখনও শেষ কথা বলেনি! বিশ্ব-জনমত তখন নেলসন এবং এ এন সি-র চোয়াল কষা আন্দোলনের পক্ষে। ক্রমশঃ চাপ বাড়ছে বোথা সরকারের ওপর। একের পর এক আন্তর্জাতিক ব্যাংক দক্ষিণ আফ্রিকায় লগ্নি বন্ধ করে দেওয়ায় তার তখন নাভিশ্বাস উঠে গেছে। এমনকি সে দেশের সাথে ক্রীড়া সম্পর্কও রাখতে চাইছে না কেউ। থ্যাচার পরামর্শ দিলেন বোথাকে নেলসনকে মুক্তি দিতে কারণ সম্ভবত তাহলেই তাঁর মুক্তির দাবিতে উত্তাল জনগণের মধ্যে যে ঘৃণার সঞ্চার হচ্ছে, তাতে কিছুটা ভাঁটা পড়বে। বাধ্য বোথা নেলসনের কাছে মুক্তির প্রস্তাব পাঠালেন, তবে সাথে জুড়ে দিলেন এই শর্ত যে, জেল থেকে বেরিয়ে তিনি সরকারের সাথে আর কোনওরকম দ্বন্দ্বের মধ্যে যেতে পারবেন না। স্বাভাবিক ভাবেই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হলো এ প্রস্তাব। ফলে সরকারের সাথে এ এন সি-র দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করলো। গোটা দেশেই তৈরি হয়ে গেল ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি। বেগতিক দেখে সরকার আবার মধ্যস্থতাকারী দল পাঠাল নেলসনের কাছে, কিন্তু তাদেরও ওই এক কথা— নেতাদের ঘোচাতে হবে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যাবতীয় সংযোগ, মেনে নিতে হবে সংখ্যালঘুদের শাসন। পত্র পাঠ তাঁদেরও বিদায় করতে দেরি করা হলো না।

১৯৮৯ সালে বোথা হৃদরোগে আক্রান্ত হলে, তাঁর জায়গা নেন এফ ডব্লু ডি ক্লার্ক। চতুর এই ভদ্রলোক বুঝেছিলেন— যে ভাবে আন্দোলন চলছে, তাতে বর্ণবৈষম্য আর বেশিদিন চালানো সম্ভব নয়। আন্দোলনের কাছে পরাজিত হওয়ার আগেই তাই তিনি উদ্যোগ নিলেন নেলসন সহ সমস্ত এ এন সি বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি দিতে, নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা সমস্ত রাজনৈতিক দলের ওপর থেকে যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে। নিজের দলের মধ্যেই দীর্ঘ এবং তীব্র বিতর্কের পর অবশেষে ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নেলসন সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের ওপর থেকে যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আদেশনামায় সই করতে সক্ষম হলেন। দীর্ঘ ২৭ বছর পর আবার মুক্ত নেলসনের ছবি মানুষ দেখল সংবাদপত্রের পাতায়। আ-বিশ্ব সম্প্রচারিত হয়েছিল সে মুক্তির দৃশ্য। মানুষ দেখলেন প্রেসের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, শান্তির সপক্ষে থাকলেও এ এন সি-র সশস্ত্র আন্দোলনের সামপ্তি ঘটেনি, তবে তখন থেকে তা শুধুমাত্র ব্যবহৃত হবে বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। তাঁর আশা, সরকার নিশ্চয়ই এমনভাবে আলোচনায় রাজি হবে, যাতে ভবিষ্যতে সশস্ত্র আন্দোলনের আর দরকার পড়বে না। অর্থাৎ মানুষ দেখলেন, তিনি মুক্তি পেলেও নিজের লক্ষ্য এবং আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি।

এর পরের চারটে বছর কেটে গেছিল ঝড়ের মত। এর মধ্যে আফ্রিকার বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর হাতে, বিশেষ করে সরকার পোষিত জঙ্গি গোষ্ঠী 'ইনকাথা'র হাতে বার বারে আক্রান্ত হতে হয়েছে এ এন সি-কে, বারে বারে সরকারের সাথে আলোচনা ভেস্তে গেছে। ফলে এ এন সি-র পক্ষে রাষ্ট্রসংঘকে টেনে আনতে বিভিন্ন দেশে সফর করতে হয়েছে নেলসনকে, এমনকি বরাবরের শত্রু দেশ ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বাদ যায়নি সে সফর থেকে। অবশেষে নেলসন এবং ডি ক্লার্ক দুজনেই ঐকমত্যে পৌঁছেছেন দেশে সাধারণ নির্বাচনের এবং এক উদার সংবিধান রচনার। নির্বাচনের দিন ঠিক হয়েছিল ২৭ এপ্রিল, ১৯৯৪। নেলসন তখন কালো মানুষদের অবিসম্বাদি নেতা, এ এন সি-র জাতীয় সভাপতি। নির্বাচনে ৬৩ শতাংশ ভোট পেলেন তাঁরা, নয়টা প্রদেশের মধ্যে সাতটাতেই তাঁরা হলেন নিরঙ্কুশভাবে জয়ী। ক্লার্কের দল আর ইনকাথা ভাগ করে নিলো বাকি দুটো প্রদেশ। স্বাভাবিক ভাবেই নেলসন হলেন রাষ্ট্রপতি, বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো তাঁর। এর আগের বছরেই ক্লার্কের সাথে যৌথ ভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে তাঁকে, কিন্তু ততদিনে অমানুষিক পরিশ্রম এবং তাঁর ওপর ঘটে যাওয়া পুরনো অত্যাচারের ফলশ্রুতিতে শরীরে বাসা বেঁধেছে নানা অসুখ। ততদিনে মারা গিয়েছেন তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু অলিভার টম্বো।

তবু কাজে বিরাম নেই। ধীরে ধীরে অত্যাচার আর দাঙ্গা বিদীর্ণ সবদিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া একটা দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা ফিরে আসতে লাগলো শান্তি আর সমৃদ্ধির পথে তাঁর হাত ধরে। দেশে সব গোষ্ঠীর জন্যে সমান দৃষ্টিভঙ্গির নীতি চালু হলো, চালু হলো বিকালাঙ্গ ভাতা, শিশুর ভরণ-পোষণের ভাতা, সবার জন্যে সমান বার্ধক্য ভাতা (আগে এক এক গোষ্ঠীর জন্য এক একরকম ছিল), গর্ভবতী মহিলা ও ছয় বছর পর্যন্ত বয়স্ক শিশুদের জন্য বিনা পয়সায় চিকিৎসা। নতুন করে শুরু হলো নানা দেশের ক্রীড়া সম্পর্ক, এমনকি বিশ্ব রাগবি টুর্নামেন্টেও অনুষ্ঠিত হলো দক্ষিণ আফ্রিকায়। ১৯৯৬ সালে চালু হলো দেশের প্রথম ভূমি সংস্কার আইন, যাতে বলা হলো একমাত্র আদালতের নির্দেশ ছাড়া কোনও ভাগ চাষিকে জমির থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না, আর তার বয়েস যদি ৬৫-র বেশি হয়, তাহলে একেবারেই উচ্ছেদ করা যাবে না। সব চেয়ে বড়ো কথা, যে দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে এক সময়ে মানুষ ফিরেও তাকাত না ঘৃণায়, সেই দক্ষিণ আফ্রিকায় পর্যটন একটা অন্যতম প্রধান শিল্পে পরিণত হয়ে গেল অচিরেই। ১৯৯৯ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের সময়ে এমন কোনও বিষয় ছিল না, যেখানে এ এন সি তাদের নীতির ফলে কোনও উন্নতি ঘটায়নি।

দেশের নতুন সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দ্বিতীয়বারের জন্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারী হলেও নেলসন সিদ্ধান্ত নিলেন আর নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। এর আগে ১৯৯৭-তে দলীয় সম্মেলনে দলীয় সভাপতির পদ থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। ১৯৯৯ থেকে তাই তাঁর পূর্ণ অবসর। নিজের অবসর জীবনটা এবার তিনি উৎসর্গ করলেন এইচ আই ভি এবং এইডস রোগাক্রান্তদের সেবার কাজে, সে মারণ রোগ নির্মূল করার কাজে। গড়ে তুললেন আন্তর্জাতিক অর্থ সহযোগিতায় 'নেলসন ম্যান্ডেলা ফাউন্ডেশন'। সারা দেশ চষে বেড়াতে লাগলেন এই মারণ রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সাথে চলতে লাগলো গ্রামীণ নানা পরিকাঠামোর উন্নতি আর বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ। ২০০৩ সালে গড়ে তুললেন অক্সফোর্ডে 'ম্যান্ডেলা রোডস ফাউন্ডেশন' সেখানে পড়াশোনা করা কালো ছাত্রদের আর্থিক সাহায্যের উদ্দেশ্যে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সতত গর্জে উঠেছেন যে সব নেতা, নেলসন এই সময়ে হয়ে উঠলেন তাঁদের প্রধানতমদের মধ্যে একজন, হয়ে উঠলেন তার বিরুদ্ধে বিশ্ব-ঐকমত্য গড়ে তোলার কাজে অক্লান্ত এক যোদ্ধা। কিন্তু মন চাইলেও শরীর আর দিচ্ছিল না। বয়েস তখন তাঁর ৮৫। ইতোমধ্যে ধরা পড়েছে প্রস্টেটে ক্যান্সার। ডাক্তার এবং পরিবারের লোকদের চাপে বাধ্য হয়ে এবার তাঁকে তাই চলে যেতে হলো লোকচক্ষুর অন্তরালে। প্রেস্টেট অপারেশন সফল হলেও তিনি আর ফিরে আসতে পারেননি তাঁর আগের জীবনে। মানুষ তাঁকে জীবিত অবস্থায় শেষ দখল ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালের সময়ে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের পতনের সেটা দশ বছর পূর্তির বছরও বটে। অবশেষে এলো আশঙ্কার সেই দিন ... ৫ ডিসেম্বর, ২০১৩ ... দীর্ঘ রোগভোগের পর পরিসমাপ্তি ঘটলো এক অতি বর্ণময় জীবনের ... প্রয়াত হলেন দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের লড়াইয়ের প্রেরণার উৎস নেলসন ম্যান্ডেলা, আফ্রিকার মানুষের কাছে যিনি শুধুই 'ম্যাডিবা', তাঁদের রাজা।

নেলসন ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি নিজের ভুলের থেকে ক্রমাগত শিক্ষা নিতেন এবং নিজেকে উন্নত করে তুলতেন। চেষ্টা করতেন পরিস্থিতির সাথে নিজের মত খাপ খাচ্ছে কিনা সদা সর্বদা যাচাই করে নিতে। এ কারণেই এক সময়ের কালো মানুষ ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে না পারা নেলসন পরে পরিণত হয়েছিলেন নির্জোট আন্দোলনের অবিসম্বাদী নেতায়। এক সময়ের কমিউনিস্ট বিরোধী নেলসন পরে পরিণত হয়েছিলেন একনিষ্ঠ মার্কসবাদীতে। নেলসন ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি নিজের আদর্শের সামনে কোনও কিছুরই রেয়াৎ করতেন না। এমনকি নিজের স্ত্রী এবং দীর্ঘ দিনের সহযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও উইনিকে ডিভোর্স করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি, যখন প্রমাণিত হয়েছিল যে তিনি সত্যি সত্যিই দুর্নীতির সাথে যুক্ত। তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি ক্ষমতার শীর্ষে উঠেও কখনও ভোলেননি নিজের শ্রেণী উৎসকে, চরম ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের সময়েও নিজেকে গুটিয়ে রাখেননি সংগঠনের কাজ থেকে, নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ থেকে। তাঁর গোটা জীবনটাই এক শিক্ষা ... তিনি ছিলেন সত্যি সত্যিই রোলিহ্লাহ্লা, এক সার্থকনামা পুরুষ। শতবর্ষে প্রণতি জানাই তাঁকে। □

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্ট্রাইক নোটিশ প্রদানের কর্মসূচী

সমকাজে সমবেতন দিতে হবে যা সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পরও বেসরকারী ক্ষেত্রেতো বটেই খোদ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারী দপ্তরগুলিতেও এই রায় কার্যকর করা হচ্ছে না। রেল, বিমা, প্রতিরক্ষায় বিদেশী পুঁজি অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। যুগ্মসম্পাদকের প্রস্তাব উত্থাপনের পরবর্তীতে এর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন যুক্ত কমিটির পক্ষে তাপস ত্রিপাঠী, স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষে বলাই শঙ্কর মিত্র। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন রাজ্য এবং কেন্দ্র দুই সরকারের বিরুদ্ধেই কর্মচারীরা দারুণ ক্ষুব্ধ। যে দুই শাসক দল কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই সরকার চালাচ্ছে তারা কখনোই শ্রমিক-কর্মচারীদের ভালো চায়নি। কেন্দ্রের শাসকদল একের পর এক শ্রমিক বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মালিকের স্বার্থে শ্রম আইন সংস্কারের নামে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। অপরদিকে বর্তমান রাজ্য সরকারের শাসনকালে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা দারুণ বঞ্চনার সম্মুখীন। সরকারী কর্মচারীর দাবির প্রতি কর্ণপাত করা দূরে থাক এই সরকার এতটাই প্রতিহিংসাপরায়ণ যে নবান্নে অধিকারের দাবি জানাতে গেলে, সরকারী কর্মী নেতৃত্বদের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে। শুধুমাত্র নবান্নে দাবির সমর্থনে শ্লোগান দেওয়ার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক সহ ১৮ জন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়, অপরাধীদের মতো টানতে টানতে পুলিশ ভ্যানে উঠিয়ে শিবপুর থানায় নিয়ে গিয়ে লকআপে আটকে রাখা হয়। পরবর্তীতে গোটা রাজ্যের কর্মচারী সমাজের ক্ষোভের মাত্রা টের পেয়ে শিবপুর থানা থেকে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া হলেও পরবর্তীতে ১৫ জন নেতৃত্বকে মুর্শিদাবাদ এবং দার্জিলিং-এর দূর দুরান্তে প্রতিহিংসামূলক বদলী করা হয়। কিন্তু রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অতীত ইতিহাস এটাই যে বদলী করে, বরখাস্ত করে সংগঠনকে ভাঙা যায় না। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রত্যন্ত ব্লকস্তরের কর্মী-নেতৃত্বরা শত আক্রমণের মুখেও সংগঠনের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে রেখেছেন। আগামীদিনেও যত আক্রমণ আসুক মতাদর্শকে পাথেয় করেই সংগঠন তার লড়াই-আন্দোলন-সংগ্রাম জারি রাখবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রতি সীমাহীন বঞ্চনার প্রতিবাদে সংগঠনের পক্ষ থেকে বহুবার বর্তমান রাজ্য সরকারের নিকট চিঠি দেওয়া হয়েছে নবান্ন অভিযান সংগঠিত হয়েছে, সরকারের পক্ষ থেকে তখন আলোচনা করা হয়েছিল, দু-দুবার পে-কমিশন কার্যকর করার দাবিতে বিকাশভবন অভিযান হয়েছে পে-কমিশনের দপ্তর ঘেরাও হয়েছে আলোচনার অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন লাভ হয়নি। তাই পশ্চিমবঙ্গে কর্মচারী সমাজও গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষের সাথে আগামী ৮-৯ জানুয়ারি ২০১৯ দু-দিন ব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে শামিল হবে। দাবি আদায়ে ধর্মঘট করা ছাড়া শ্রমজীবীদের আর কোনও পথ নেই। শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে আমাদের ঐক্যকে ভাঙতে বিভাজনের রাজনীতিকে সামনে আনার চেষ্টা করা হবে। এ বিষয়েও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের নিবিড় ঐক্য গড়েই দু-দিনের ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বান জানান তিনি। সমাবেশের প্রধান বক্তা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাম পরিষদীয় দলনেতা ডঃ সুজন চক্রবর্ত্তী তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মী-নেতৃত্বদের বিশেষত নবান্নে শ্লোগান দেওয়ার অপরাধে পুলিশের হাতে আক্রান্ত নেতৃত্বদের কুর্ণিশ জানান রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এরকম প্রতিহিংসামূলক দানবীয় আক্রমণের মুখেও গোটা রাজ্যের কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে রেখে আন্দোলন-সংগ্রাম জারি রাখার জন্য। তিনি বলেন, দিল্লীর মোদী সরকার এবং রাজ্যের সরকার এই দুই সরকারকেই জবাব দিতে হবে দেশের মানুষের স্বার্থবিরোধী, শ্রমজীবী-মেহনতী মানুষের স্বার্থবিরোধী, কৃষকের স্বার্থবিরোধী একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। যদি জবাব না দিতে পারেন তাহলে আগামীদিনের দেওয়াল লিখন স্পষ্ট করে পড়ে নিতে হবে দেশ ও রাজ্যের দুই সরকারকেই। দেশের শ্রমজীবী মানুষেরা ঝাণ্ডার রঙ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন, দেশের কৃষক সমাজ লাল ঝাণ্ডার নেতৃত্বে পথে নামছেন। সাম্প্রতিক পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে সেখানকার কৃষক সমাজ দেশের বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। এই সরকারের বিরুদ্ধে আগামীর ধর্মঘট এক নতুন ইতিহাস রচনা করবে। রাজ্যের বর্তমান সরকারকে তোলাবাজি ও লুঠেরার সরকার বলে মন্তব্য করে এদিনের সভায় সুজন চক্রবর্ত্তী আরও বলেন পুলিশসহ রাজ্য সরকারের সমস্ত কর্মচারীরা দিনের পর দিন বঞ্চিত হয়ে চলেছেন আর জনগণের টাকা ভাগ বাঁটোয়ারায় ব্যস্ত শাসকদলের লোকজন। দুর্নীতিতে বর্তমান রাজ্য সরকারের জুড়ি মেলা ভার। শিক্ষক নিয়োগ নেই, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দুর্বল হয়ে চলেছে। পিএসসি দুর্নীতির আখড়া হয়ে পড়েছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরম আকার নিয়েছে। সমস্ত রাজ্য থেকে এখানে বেতন কম দেওয়া হচ্ছে। সরকারী সমস্ত স্তরে, মিড ডে মিলে দুর্নীতি বাড়ছে। শুধু তাই নয়, অন্যদিকে আবার নৈরাজ্য, নারী নির্যাতনে সর্বোচ্চ স্থান পাচ্ছে রাজ্য। সব দৃষ্টি ঘোরাতে রথযাত্রা বা খোল করতালের আয়েজন চলছে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে। কোথা থেকে আসছে এইসব টাকা তার হিসাব চাইবেন মানুষ। দুই সরকারের বিরুদ্ধেই দেশের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষ ঐক্যবদ্ধ দেশজোড়া দু'দিনের ধর্মঘটের মধ্য দিয়েই তাঁদের জবাব দেবেন। আর আগামী লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে দেশের শাসকশ্রেণীকে চরম হুঁশিয়ারীর মধ্য দিয়ে আমাদের একযোগে বলতে হবে শাসক তুমি তোমার নীতি বদলাও নাহলে আমরা তোমাকেই বদলে দেওয়ার সংগ্রামে ব্রতী হব। আমার বিশ্বাস রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মী, নেতৃত্বরা অতীত ঐতিহ্যকে ধারণ করেই আগামী দেশজোড়া দু'দিনের ধর্মঘটকে ঐতিহাসিক ধর্মঘটে পরিণত করতে স্ব স্ব ভূমিকা প্রতিপালন করবেন। এদিন ধর্মঘটের সমর্থনে তোলা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সমাবেশ পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর বাগচী (স্টিয়ারিং কমিটি) ও ভবতোষ রায়কে (যুক্ত কমিটি) নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

দেবাশীষ রায়

মোদী সরকারের নয়া সংরক্ষণ নীতি ও কিছু প্রশ্ন

সম্প্রতি মোদী সরকার খুবই তাড়াহুড়ো করে সংসদের নিম্নকক্ষে (লোকসভায়) ১২৪তম সংবিধান সংশোধনী সংক্রান্ত খসড়া আইন অনুমোদন করিয়েছে। এই আইনে, এযাবৎকাল সংরক্ষণের আওতার বাইরে থাকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা আর্থিক অবস্থার নিরিখে দুর্বল, তাঁদের জন্য সরকারী চাকুরিতে ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এই আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী আর্থিক দিক থেকে দুর্বল বর্ণ হিন্দু, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি অংশ তো বটেই, এমনকি সম্ভবত মুসলিম ও খ্রিস্টানদেরও এই সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার কথা। স্বভাবতই লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্‌কালে দ্রুত এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকে মিডিয়া মোদীজীর 'মাস্টার স্ট্রোক' বসে প্রচার শুরু করে দিয়েছে। আর্থিক দিক থেকে দুর্বল অংশের জন্য সংরক্ষণ কথাটি শুনতে মন্দ না হলেও এবং আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেশ্যটি সাধু হলেও, কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়, যা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যেমন—

(১) লোকসভা নির্বাচনের মাত্র ৯০ দিন আগে, অতিরিক্ত ১০ শতাংশ সংরক্ষণের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন তৈরি করা হলো, অথচ তা কার্যকরী করার মতো যথেষ্ট সময় সরকারের হাতে নেই। তাহলে এই সময়ে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে কি সত্যিই কোনো সৎ উদ্দেশ্য রয়েছে? না কি এটি শুধুমাত্রই একটি রাজনৈতিক চমক?

(২) ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে সামাজিক বঞ্চনা ও শতাব্দী প্রাচীন জাত ভিত্তিক বৈষম্যকে দূর করার জন্য। যেখানে শুধুমাত্র আর্থিক অবস্থার নিরিখে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা কি সংবিধানের মূল সুরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?

(৩) এমনটা যদি হয়ও যে, সংসদের উভয় কক্ষেই এই খসড়া আইনটি অনুমোদিত হলো। তাহলেও কি লোকসভা নির্বাচনের আগে এই অল্প সময়ে ৫০ শতাংশের বেশি রাজ্য বিধানসভায় এই সংশোধনটি অনুমোদিত হবে? আবার ৫০ শতাংশ বা তার বেশি রাজ্য বিধানসভা যদি সংশোধনীটিকে অনুমোদন করেও, তাহলেও কি আইনগত বা সাংবিধানিক বৈধতার মাপকাঠিতে সুপ্রিম কোর্ট এটিকে অনুমোদন করবে? কারণ সুপ্রিম কোর্টই অতীতে রায় দিয়েছে যে, সমস্ত ধরনের সংরক্ষণের সর্বোচ্চ সীমা হবে ৫০ শতাংশ। ইতোমধ্যেই এস. সি, এস. টি, ওবিসিদের জন্য মোট সংরক্ষণের পরিমাণ হলো ৪৯.৫ শতাংশ।

(৪) অতীতে ভারতীয় জনতা পার্টি ভি পি সিং-এর 'মণ্ডল রাজনীতি'র (সংরক্ষণ সম্পর্কিত বি পি মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ) তীব্র বিরোধীতা করে 'কমণ্ডল রাজনীতি'-র জন্ম দেয়। যার কেন্দ্রে ছিল রামজন্মভূমি বিতর্ক। ভি পি সিং সরকারের পতনের অন্যতম কারণও ছিল এটি। কিন্তু আজ ২৫ বছর পরে, বিজেপি নিজেই সংরক্ষণের রাজনীতি নিয়ে আসরে নামলো কেন? এই ভোল বদলানোর কারণ কি সদ্য অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের ধাক্কা? না কি বিজেপি বুঝতে পারছে শুধুমাত্র অযোধ্যা ইস্যুতে সমস্ত হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করে নির্বাচনে জেতা সম্ভব নয়?

(৫) মোদী সরকার ক্ষমতায় এসেছিল 'বিকাশ পুরুষ' হিসেবে নরেন্দ্র

মোদীর ভাবমূর্তি নির্মাণ করে। 'গুজরাট মডেল'-এর সফল রূপকার বিকাশ পুরুষ। তাহলে 'বিকাশ পুরুষ'-এর বেশ ছেড়ে 'সংরক্ষণ পুরুষ' হওয়ার চেষ্টা কেন? তাহলে কি বিজেপির উন্নয়নের স্লোগানকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে?

(৬) বর্তমান সংরক্ষণ আইনে বলা হয়েছে, যাঁদের বাৎসরিক আয় ৮ লক্ষ টাকার কম বা ৫ একরের কম পরিমাণ জমির মালিক, তাঁরাই এই সংরক্ষণের আওতায় আসবে। বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা মানে মাসিক ৬৬,০০০ টাকা! তাহলে কি এটাই ভারতের নতুন দারিদ্র্য সীমারেখা? তা যদি হয়, তাহলে মাসিক ২০,০০০ টাকা বেশি আয়ের লোকেদের কাছ থেকে কর আদায় করা হয় কেন? কেনই বা মাসিক ন্যূনতম ১৮,০০০ টাকা মজুরির দাবিতে শ্রমিকদের ধর্মঘটে যেতে হয়?

(৭) বিজেপি মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য নীতিন গড়করি সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, দেশের অর্থনীতি যথেষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না। তা যদি হয়, তাহলে এই অতিরিক্ত সংরক্ষণে লাভ কী? এমনকি বর্তমান ৪৯.৫ শতাংশ সংরক্ষণেরও কোনো মূল্য নেই। কর্মসংস্থানহীন সংরক্ষণ মানে মরুভূমিকে ভাগ করা। যে অংশই হাতে পাও, শস্য ফলানোর জন্য জল পাওয়া যাবে না। কাউন্সিল ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত এক তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র ২০১৮ সালেই আমাদের দেশে ১ কোটি ১০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ নষ্ট হয়েছে। তাই এই ধরনের সংরক্ষণ শুধুমাত্র ফাঁপা প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কী দিতে পারে? তাছাড়া, বেসরকারী ক্ষেত্রকেও সংরক্ষণের আওতায় আনার ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করতে না পরলে, এই সংরক্ষণ কি আদৌ ফলদায়ী হবে?

(৮) বিজেপি সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ-বেনিয়াদের দল হিসেবেই পরিচিত। উচ্চবর্ণের জন্য সংরক্ষণের এই সিদ্ধান্ত কি সেই পরিচয়কেই আরো স্পষ্ট করবে না? আবার, যদি সুপ্রিম কোর্ট ৫০ শতাংশের ঊর্ধ্বের এই সংরক্ষণকে বাতিল করে দেয়, তাহলে কি একে ৫০ শতাংশের মধ্যে ঢোকানোর জন্য, নিম্নবর্ণের জন্য স্বীকৃত সংরক্ষণের পরিমাণ হ্রাস করা হবে? বিজেপি এই রাজনৈতিক ঝুঁকি নিতে পারবে তো?

(৯) যদি দরিদ্রতর অংশের আর্থিক দুরাবস্থার সুরাহা করতেই হয়, সেক্ষেত্রে 'সংরক্ষণ' কৃষি ঋণ মকুব, 'এম এন রেগা', বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ বা স্বল্প খরচে শিক্ষাদানের মতো কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা? পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ব্যতিরেকে শুধুমাত্র সংরক্ষণ কি আদৌ কোনো পরিবর্তন আনতে পারে?

(১০) ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতাগণ সংরক্ষণকে স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম এক দশকের জন্য একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে তার মেয়াদ বারংবার বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাহলে, আর্থিক অবস্থার নিরিখে অতিরিক্ত সংরক্ষণেরও একই পরিণতি হবে না, এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে কি? সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা বা দারিদ্র দূরীকরণের জন্য সংরক্ষণ কি আদৌ দীর্ঘমেয়াদী কার্যকরী ব্যবস্থা?

যাই হোক এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রশ্ন এবং বামপন্থী দলগুলি ব্যতিরেকে বাকি সমস্ত রাজনৈতিক দল শুধুমাত্র ভোট-ব্যাঙ্ক তৈরি করার জন্য সংরক্ষণকে ব্যবহার করে আসছে। □ *সূত্র ঃ দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকা*

সমিতি সম্মেলন

কৃষি কারিগরী কর্মীসংস্থার ৫০তম রাজ্য সম্মেলন বিগত ২৯-৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ বর্ধমান শহরে কর্মচারী ভবনে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান-এর মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। ৫০তম মহতী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ সম্পাদক অনুপ বিশ্বাস, সংগঠনের আগামী করণীয় সহ ৮-৯ জানুয়ারি ২০১৯ সর্বভারতীয় ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বান জানান তিনি। এছাড়াও সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ৫০তম সম্মেলন উপলক্ষ্যে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অরূপ কুমার চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক প্রণব আইচ, অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বর্ধমান জেলা সম্পাদক করালী চ্যাটার্জী। সম্মেলনে প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ মানস দাস। ৮-৯ জানুয়ারি ২০১৯ সর্বভারতীয় ধর্মঘটের সমর্থনে একটি পৃথক প্রস্তাব পেশ করেন সংগঠনের অপর যুগ্ম সম্পাদক প্রশান্ত চন্দ। খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক মনোজ সাহা ও অন্যতম সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পরাগ কোনার এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সহ-সম্পাদকদ্বয় শুভাশীষ চক্রবর্ত্তী ও সৌমেন চ্যাটার্জী। দাবী প্রস্তাব পেশ করেন অন্যতম সহ-সম্পাদক দীপঙ্কর দাস এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সহ-সম্পাদক গণেশ ঠাকুর। ১৯টি জেলার পক্ষ থেকে ২৪ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উত্থাপিত প্রতিবেদন, প্রস্তাবাবলী, ৮-৯ জানুয়ারি ধর্মঘট এবং সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতি ও সংগঠনের আগামী লড়াই আন্দোলন প্রসঙ্গে তাদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। সমগ্র আলোচনাকে সূত্রায়িত করে জবাবী বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুর্নিমল রায়।

সম্মেলন থেকে ৪৩ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ২২ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। অমিতাভ সাহা সভাপতি, সুনির্মল রায় সাধারণ সম্পাদক, রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য ও প্রশান্ত চন্দ যুগ্ম সম্পাদক, মানস দাস কোষাধ্যক্ষ, অতনু দাশগুপ্ত দপ্তর সম্পাদক, দেবাশীষ রায় পত্রিকা সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। সম্মেলন পরিচালনা করেন সভাপতি নবকুমার সিং এবং সহ সভাপতিদ্বয় শ্যামাপদ পাল ও অমিতাভ সাহাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সম্মেলনের প্রক্কালে ২৮ ডিসেম্বর বিকাল ৫:৩০ মিনিটে প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র এবং সমিতির মুখপত্র আন্দোলনের অরুনিম পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক মানস কুমার বড়ুয়া। একইসঙ্গে সংগঠনের সদস্যদের বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তিনি মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। রাজ্য সম্মেলনের পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র থেকে প্রতিনিধিরা প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার পুস্তক ক্রয় করেন। এছাড়া ২৯ ডিসেম্বর সম্মেলনের উদ্বোধনী সমাবেশের পরবর্তীতে সমিতির প্রাক্তন নেতৃত্বদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানটি সম্মেলনে এক অন্য মাত্রা যুক্ত করেছে। □

গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৮, শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মচারী সমিতির দ্বি-বার্ষিক ৩৮তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। প্রয়াত কমরেড সুকোমল সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছিল কমরেড সুকোমল সেন মঞ্চ। ৩৫ জন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধি, ৩২ জন মহিলা প্রতিনিধি সহ মোট ১০৫ জন প্রতিনিধি ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য চন্দন ঘোষ ঐ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধক তাঁর ভাষণে বিগত দু'দশক ধরে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্যে ঘটে চলা পরিস্থিতির ব্যাখা দেন। শ্রমিক স্বার্থকে সন্ত্রাস দিয়ে দমন করার চেষ্টা চলছে বলে তিনি জানান। রাজ্যের সরকারী কর্মচারী মহল যখন তাদের যুক্তিযুক্ত দাবি-দাওয়া নিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে লড়াই সংগ্রাম করছে, তখনই সরকারী তরফে দমন পীড়ন নামিয়ে আনা হচ্ছে বলে তিনি জানান। তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে আরো ঐক্যবদ্ধ লড়াই সংগ্রামের আহ্বান জানান।

মোট ১২টি দাবি দাওয়া সমেত খসড়া প্রস্তাবাবলী, সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং বিগত দু'বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্মেলনে পেশ করা হয়। ৬ জন প্রতিনিধি (২ জন মহিলাসহ) আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা তাঁদের আলোচনায় কেন্দ্রীয় কমিটির কাজের পর্যালোচনা করেন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে আগামীদিনে লড়াই আরো জোরদার করার আহ্বান রাখেন।

সম্মেলন মঞ্চে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক হারাধন চক্রবর্তী। সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাজীব দে তাঁর জবাবী ভাষণে বিগত দু'বছর ধরে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সমিতি কিভাবে লড়াই-আন্দোলন জারী রেখে কর্মচারী স্বার্থের জন্য কাজ করছে, তা জানান।

সমগ্র সম্মেলনটি পরিচালনা করেন তমাল মজুমদার, অপূর্ব সাহা ও দীপক ভট্টাচার্যকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শংকরপ্রসাদ দাস, সাধারণ সম্পাদক রাজীব দে, যুগ্ম সম্পাদক হারাধন চক্রবর্তী ও কোষাধ্যক্ষ ধ্রুব দাশগুপ্ত নির্বাচিত হন। সম্মেলন মঞ্চ থেকে বিদায়ী তিনজন অবসরপ্রাপ্ত নেতৃত্বকে সম্বর্ধনা জানানো হয় সমিতির পক্ষ থেকে। সামগ্রিকভাবে অনাড়ম্বর অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানসিকতায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের সুচিন্তিত মতামত ও আলোচনায় সফল হলো ৩৮-তম রাজ্য সম্মেলন। □

পশ্চিমবঙ্গ প্রেস এ্যান্ড ফর্মস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ২৯তম সম্মেলন ৮ ও ৯ জানুয়ারি ২০১৯ দু'দিনের ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়েছে।

৮ ডিসেম্বর ২০১৮ ফর্মস দপ্তরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ সভাপতি প্রশান্ত সাহা। উদ্বোধনী ভাষণে উদ্বোধক উদারবাদী অর্থনীতির আক্রমণ, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি পালন না করা, সাম্প্রদায়িক বিভাজন, রাজ্যের নৈরাজ্য ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বক্তব্য রাখেন। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা ও পে-কমিশনের দাবিতে নবান্ন কাঁপানো আন্দোলন ও গ্রেপ্তার এবং নেতৃত্বের বদলীর বিরুদ্ধে ৮ ও ৯ জানুয়ারি ২০১৯ সর্বাত্মক ধর্মঘটের আহ্বান জানান। সম্মেলন এই ধর্মঘট সফল করার জন্য প্রস্তাব ও গ্রহণ করে।

সম্মেলন থেকে অমিত ব্যানার্জীকে সভাপতি, সুদীপ্ত ভট্টাচার্যকে সাধারণ সম্পাদক ও অভিজিত কুমার পালকে কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত করা হয়। □

আলোচনাসভা

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, **মালদা জেলা** শাখার উদ্যোগে ৬ ডিসেম্বর '১৮ কর্মচারীভবনে আজ থেকে ২৬ বছর পূর্বে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংস, সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও উন্মাদনা এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমজীবীদের করণীয় সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনাসভা। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল "বর্তমান ভারতে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপদ ও শ্রমজীবীদের করণীয়।" এদিনের আলোচনাসভার প্রাসঙ্গিকতা ও আগামী কর্মসূচী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক সুবীর রায়। বিষয়বস্তুর উপর বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন আলোচনাসভার মুখ্য আলোচক কর্মচারী আন্দোলনের নেতা তথা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রতন ভাস্কর।

তিনি বলেন, বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার অর্থ শুধু ৬০০ বছরের পুরাতত্ত্বের ধ্বংস সাধন নয়, ভারতীয় সংবিধানের মূল মর্মবস্তু ধর্মনিরপেক্ষতার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ধর্মের নামে উন্মাদনা তৈরি করা। আর মৌলবাদ হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার মতাদর্শগত ভিত্তি। সাম্প্রদায়িক শক্তি মৌলবাদকে নির্মাণ করে। অর্থাৎ মৌলবাদ হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়ার। আমাদের রাজ্যেও চলছে একইভাবে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা। উভয়েই শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। তাই এই সার্বিক জনবিরোধী ও শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তিনি আগামী ৮ ও ৯ই জানুয়ারি ২০১৯ সর্বভারতীয় ধর্মঘটকে সফল করে বর্তমানের এই ভয়াবহ বিপদ থেকে ভারতবাসীকে রক্ষা করার আহ্বান জানান। আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রদীপরঞ্জন বসু। □

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, **মালদা জেলা** শাখার উদ্যোগে ১৫ নভেম্বর '১৮ কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত হলো এক আলোচনাসভা। আলোচনাসভার বিষয়বস্তু ছিল "স্বাধীনতা উত্তরকালে কর্মচারী আন্দোলনের গতি প্রকৃতি।" আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করেন কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক সুবীর রায়। তিনি বলেন ১৯০৪ সালে সার্ভিস কনডাক্ট রুলস্ তৈরী করে কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়। তথাপি কর্মচারীরা তাদের প্রাপ্য বেতন-ভাতার দাবিসহ পেনশনের দাবিতে সংগঠিত হবার চেষ্টা করে। বি.জি.প্রেসের কর্মচারীরা ধর্মঘটে শামিল হয়। স্বাধীনতার পরেও সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে অনেক বাধা অতিক্রম করে নিরন্তর লড়াইয়ে কর্মচারীরা শামিল ছিলেন। তাই এর ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৬ সালে শ্রমিক-কর্মচারীদের যৌথ মঞ্চ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আত্মপ্রকাশ করে। সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী প্রতিটি ক্ষেত্রেই এরপর থেকে লড়াই-আন্দোলন সমানভাবে জারি আছে। বিগত সময়ে কর্মচারীদের নিদারুণ আর্থিক দুর্দশা থেকে কর্মচারীদের মুক্তি দিয়েছিল, বামফ্রন্ট সরকার। তা ছিল কর্মচারীদের কাছে অপ্রত্যাশিত। কিন্তু বর্তমানে কর্মচারীরা নিদারুণ আর্থিক বঞ্চনার শিকার। এই চরম বঞ্চনা ও কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা ও বেতন কমিশনসহ অধিকার-মর্যাদার লক্ষ্যে একমাত্র যে সংগঠন কর্মচারীদের সংগঠিত করে লড়াই করে সেটা হচ্ছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। তাই আগামী দিনে দাবি আদায়ে ৮ ও ৯ই জানুয়ারি ধর্মঘটকে আমাদের সফল করতেই হবে। আলোচনাসভা পরিচালনা করেন মলি দাস। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
47th Year, 8th Issue, December 2018

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

সাধারণ ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে দুপুরে শুনশান কলকাতা।

দু'দিনই অচল ছিল পাঞ্জাব। অমৃতসরে প্রতিবাদে শামিল শ্রমজীবীরা

ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে কেরালার বর্ণাঢ্য মিছিল

বন্ধ গুদাম-দোকান। আগরতলার গোলবাজারে মুটে-মজুররা বসে রয়েছেন

মুম্বাইয়ে দু'দিনই অচল ছিল সড়ক পরিবহন

ধর্মঘটের সমর্থনে কলকাতার খিদিরপুরে শ্রমজীবীদের সভা।

অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ানগরমে শ্রমিকদের বিশাল মিছিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্তব্ধ উৎপাদনের চাকা

ছাড়েননি তাঁরা।

দু'দিন ধরে প্রায় কুড়ি কোটি মানুষ রাস্তায় ছিলেন। মিছিল, অবরোধ, রাস্তা রোকো, রেল রোকোয় সরকারি, বেসরকারি থেকে সংগঠিত-অসংগঠিত, অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্র অচল হয়ে গিয়েছিল। এমনকী বহু বহুজাতিক সংস্থায়ও ঘটেছে ছন্দপতন। উত্তর থেকে দক্ষিণ দেশের নানা প্রান্তেই সারা দিনের ধর্মঘটের পর সন্ধে নামতেই শুরু হয়ে যায় রাতের প্রস্তুতি। ফের বৈঠকে বসে স্ট্রাইক কমিটি। পরের দিনের ধর্মঘটের প্রস্তুতি বৈঠক।

জনবিরোধী, দেশবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ডাকা ধর্মঘটে শামিল হন সমাজের সকল অংশের মানুষ। কৃষক, খেতমজুর থেকে ছাত্র-যুব-মহিলারা। অফুরন্ত ছিল সংহতির সমর্থন। ধর্মঘটে প্রতিফলিত হয়েছে তাদের রোষ-অসন্তোষ। শ্রমিক আন্দোলন রূপান্তরিত হয়েছে গণআন্দোলনে। নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলনের নতুন এক অধ্যায় রচিত হয়েছে গত দু'দিনের ধর্মঘটে। অচল ছিল গ্রাম ভারত। শ্রমিকদের এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছিল সারা ভারত কৃষকসভা, ভূমি অধিকার আন্দোলন, অল ইন্ডিয়া কিষাণ সংঘর্ষ কোঅর্ডিনেশন কমিটি। কেরল,তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, কর্নাটক, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং ত্রিপুরায় পুরোপুরি সফল হয়েছে গ্রাম-বন্ধ। অন্যান্য রাজ্যগুলিতে হয়েছে রাস্তা রোকো, রেল রোকো।

ধর্মঘট শুরু হয় মঙ্গলবার ভোর ছ'টা থেকে। যদিও তার আগের রাত ১২টা থেকেই খাদানে-বন্দরে শুরু হয়ে যায় বন্ধ। শেষ হয়েছে বৃহস্পতিবার ভোর ছ'টায়। এসমা, পুলিশের দমনপীড়ণ নীতি উড়িয়েই গত দু'দিনের হার না মানা ধর্মঘট এগিয়েছে প্রতি ঘণ্টায়। একেবারে নিচের স্তরে এই অভূতপূর্ব শ্রমিক ঐক্যে অভিভূত দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নও। এই ঐক্য অটুট রেখেই আরো বড় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে শ্রমিক নেতৃত্ব। এরাজ্যে ধর্মঘট ভাঙার জন্য রাজ্য সরকারের পুলিশ এবং শাসক দলের গুণ্ডাবাহিনীর তৎপরতা ছিল বিস্ময়কর। ধর্মঘট মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ডাকা হলেও, সেই ধর্মঘটকে ভাঙার জন্য রাজ্য সরকার ছিল মরিয়া। যদিও যাবতীয় আক্রমণ, অত্যাচার, গ্রেপ্তার ইত্যাদি মোকাবিলা করেই রাজ্যে শ্রমজীবী মানুষ দু'দিন ব্যাপী ধর্মঘটকে সম্পূর্ণ সফল করে তুলেছিলেন। রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও প্রশাসনিক হুমকি উপেক্ষা করে এই ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন। □

সাধারণ ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনেও যাদবপুরে জোরালো প্রতিবাদ

দিল্লীতে হুঁশিয়ারি মোদী সরকারকে

বারাণসীতে কৃষকদের রেল অবরোধ

সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে দ্বিতীয় দিনে মিছিল শ্রীরামপুরে

হরিয়ানার রোহতকে শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘটের দিনে মিছিল

ঝাড়খণ্ডে বোকারো ইস্পাত কারখানার গেটে শ্রমিকদের পিকেটিং

ছত্তিশগড়ের দাল্লি রাজহারা লোহার খনির শ্রমিকরা সম্পূর্ণ কাজ বন্ধ করে যোগ দিলেন ধর্মঘটে

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।